ইসলামী
আইন

সাইয়েদ
আবুল
আ'লা
মওদূদী

ইসলামী আইন

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ঢাকা

ইসলামী আইন

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

অনুবাদ
মুনিরুদ্দীন আহমদ

প্রকাশক
আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী
৪৯১/১, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৩১২৯২

প্রকাশকাল
১ম সংস্করণ- নভেম্বর ১৯৯১ ইং
২য় সংস্করণ- আগস্ট ১৯৯৫ ইং

মূল্য
২০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে ঃ
এস, খান প্রিন্টার্স
৪৯৪, বড় মগবাজার
ওয়ারলেছ রেলগেইট, ঢাকা-১২১৭

Islami Ayeen
by
Sayyed Abul A'la Maudoodi
Published by
Sayyed Abul A'la Maudoodi Research Acadamy Dhaka
Price 20.00 Taka only

আমাদের কথা

এই পুস্তিকাটি মূলত দু'টি ভাষণের সংকলন। মাওলানা লাহোর ল'কলেজে আইনজীবীদের সমাবেশে এ ভাষণগুলো প্রদান করেছিলেন।

ইসলামী আইন সম্পর্কে যে কেবল অমুসলিমরাই অজ্ঞ, তা নয়। বরঞ্চ সাতচল্লিশ সালে উপমহাদেশে একটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর দেখা গেছে, মুসলিম নেতৃবৃন্দ এবং আইনজ্ঞরাও ইসলামী আইন সম্পর্কে অজ্ঞ অনভিজ্ঞ। এটা ছিলো ইংরেজদের শাসন ও তাদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থারই কুফল।

কিন্তু যেহেতু একটি নিরেট ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী ও আন্দোলন এখানে তীব্রতা লাভ করেছে, সে কারণে ইসলামী আইনের ব্যাপারে লোকদের মধ্যে ব্যাপক অনুসন্ধিৎসা এবং সাথে সাথে অনেক প্রশ্নও সৃষ্টি হয়েছে।

এ দু'টি ভাষণে মাওলানা ইসলামী আইনের সঠিক পরিচয় এবং এর বাস্তবতা ও স্বাভাবিকতা অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। ইসলামী আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রসূত যেসব প্রশ্ন এবং অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, সেগুলোরও অকাট্য জবাব প্রদান করেছেন। ইসলামী আইন সম্পর্কে মৌলিক ধারণা লাভের জন্য এ একটি চমৎকার পুস্তিকা।

পুস্তিকাটি দ্বারা বুদ্ধিজীবী মহল উপকৃত হলে আমাদের প্রকাশনা সার্থক বলে মনে করবো।

আবদুস শহীদ নাসিম

২৮.১০.৯১ ইং

সূচীপত্র

ইসলামী আইন ৮
আইন ও জীবন বিধানের পারস্পরিক সম্পর্ক ১১
জীবন বিধানের চৈন্তিক ও নৈতিক ভিত্তি ১২
ইসলামী জীবন বিধানের উৎস ১৩
ইসলামের জীবন আদর্শ ১৪
সত্যের মৌল ধারণা ১৫
ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাখ্যা ১৬
মুসলিম সমাজ কাকে বলে? ১৬
শরীয়তের উদ্দেশ্য ও নীতিমালা ১৭
শরীয়তের ব্যাপকতা ২০
শরীয়তের বিধান অবিভক্ত ২১
শরীয়তের আইনগত দিক ২৪
ইসলামী আইনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ২৫
ইসলামী আইনের গতিশীলতা ২৭
অভিযোগ ও জবাবসমূহ ঃ ৩২
১. ইসলামী আইনের 'পুরানো' হওয়ার অভিযোগ ঃ ৩২
২. বর্বরতার অভিযোগ ৩৩
৩. ফেকাহ শাস্ত্রে মতবিরোধের অভিযোগ ৩৫
৪. অমুসলমান সংখ্যালঘুদের সমস্যা ৩৭
ইসলামী আইন কোন্ পন্থায় কার্যকর হতে পারে? ৩৯
তড়িৎ বিপ্লব সম্ভব নয়, বাঞ্ছিতও নয় ৩৯
ধীরে চলার নীতি ৪০
নবী যুগের আদর্শ ৪০
ইংরেজ যুগের উদাহরণ ৪২
ধীরে না চলে উপায় নেই ৪৩
একটি মিথ্যে অজুহাত ৪৩
সঠিক কর্মপন্থা ৪৫
ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার জন্য গঠনমূলক কাজ ৪৮
১. একটি আইন একাডেমী প্রতিষ্ঠা ৪৮
২. বিধি নিষেধসমূহের সংকলন ৫২
৩. আইন শিক্ষার সংস্কার ৫৩
৪. বিচার ব্যবস্থার সংস্কার ৫৭
৫. ওকালতি পেশার নির্মূলকরণ ৫৭
৬. কোর্ট ফি রহিতকরণ ৬১
শেষ কথা ৬২

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলামী আইন[1]

আজকাল শুধু অমুসলিম দেশেই নয়, অনেক মুসলিম দেশেও যখন ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই বহুতর অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়। শতাব্দির পুরানো আইন কি বর্তমান যুগের সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট? একটি বিশেষ সময়ের আইনকে সর্বকালের জন্য গ্রহণযোগ্য মনে করা কি বোকামী নয়? এই উন্নত দিনেও কি হাতকাটা ও বেত্রাঘাতের মতো হিংস্র শাস্তি দেয়া হবে? আমাদের বাজারে কি তবে আবার গোলামের বেচাকেনা চলবে? তদুপরি মুসলমানদের কোন্ দলের আইন (ফেকা) এখানে জারি হবে? অতঃপর অমুসলিম যারা এই সমাজে বাস করছে তারা কিভাবে এটা মেনে নেবে যে, তাদের ওপর মুসলমানদের ধর্মীয় আইন চালু করা হবে? এ ধরনের আরো অনেক প্রশ্ন আছে, যা ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার কথা উঠলেই আপনার সম্মুখে এনে উপস্থিত করা হবে। এ সব কথা যে শুধু অমুসলিমদের মুখেই শোনা যায় তা নয়–মুসলমানদের মধ্যেও বহু উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিদের মুখেও আজকাল এ সব শোনা যায়।[2]

---

[1] ১৯৪৮ সালের ৬ জানুয়ারী লাহোর ল' কলেজে প্রদত্ত বক্তৃতা

[2] মনে রাখা দরকার, পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে এ শ্রেণীটি এসব প্রশ্নে মুখ খোলেনি। বরঞ্চ তারা মুসলমানদের নিশ্চয়তা দিচ্ছিল যে, আমাদেরকে আমাদের জীবনদর্শন অনুযায়ী জীবন যাপনের জন্য একটি পৃথক দেশ প্রয়োজন। কিন্তু দেশটি হস্তগত হবার পর তারা এসব প্রশ্ন উত্থাপন করতে শুরু করে।

এর কারণ এ নয় যে, এদের সাথে ইসলামের কোনো শত্রুতা আছে, সত্যিকার অর্থে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতাই এদের মনে এসব প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। মানুষের চরিত্রই হচ্ছে, যে বিষয় সম্পর্কে তার জ্ঞান নেই, তার নাম শুনলেই তার মনে নানা রকম ধোকা ও প্রশ্ন সৃষ্টি হয়। এবং দূরের সে জিনিসের প্রতি তার মনে ভালোবাসার পরিবর্তে ভীতির সঞ্চারই হয় বেশী। আমাদের দুর্ভাগ্যের দীর্ঘ ইতিহাসের এও একটি দুঃখজনক অধ্যায় যে, আজ শুধু বাইরের লোকেরাই নয়, আমাদের স্বজাতির লোকদের অধিকাংশও তাদের দ্বীন–ধর্ম থেকে এবং তাদের পূর্ব পুরুষদের বিশ্বাস ও উত্তরাধিকার থেকে রীতিমত অজ্ঞ ও ভীত–সন্ত্রস্ত। এ অবস্থায় কিন্তু আমরা রাতারাতি এসে পড়েনি। দীর্ঘদিনের অধঃপতনের ফলেই আমরা এ অবস্থায় এসে পৌছেছি, সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমাদের মধ্যে সভ্যতা সংস্কৃতির উথান, জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা বলতে গেলে বন্ধই ছিল। এই স্থবিরতার ফলেই আমাদের ওপর রাজনৈতিক অধঃপতন এলো। দুনিয়ার মুসলমান জাতিসমূহ হয়তো কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রের অধীন হয়ে গেলো, নতুবা তাদের মধ্যে দু'এক জাতির এতোটুকু স্বাধীনতা অর্জিত হলো, যা কোনো অবস্থায় গোলামীর চেয়ে উন্নততর ছিলো না, কেননা পরাজিত মানসিকতার প্রভাব তাদের মন মগজের অভ্যন্তরে তখনো বিদ্যমান ছিলো। পরিশেষে একদিন যখন আমরা অধঃপতন থেকে দাঁড়াতে চাইলাম, তখন সব মুসলমান–চাই সে সরাসরি অন্যের গোলাম হোক কিংবা নামে মাত্র স্বাধীন, তার দাঁড়াবার একই পদ্ধতি সর্বত্র দেখা গেলো এবং তা হলো, নতুন সভ্যতা সংস্কৃতি ও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্য নেয়া। আমদের ধর্মীয় জ্ঞানের অনুবর্তনকারীরাও সেই সার্বিক অধঃপতনের শিকার ছিলো, যাতে গোটা জাতিই আকন্ঠ নিমজ্জিত ছিল। ধর্মের ভিত্তিতে কোনো সৃষ্টিধর্মী ও বিপ্লবাত্মক তৎপরতা দেখানো ছিল তাদের সাধ্যের অতীত। তাদের পথ প্রদর্শন থেকে নিরাশ হয়ে জাতির অবশিষ্টাংশ ঐ জীবন বিধানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেলো, সুস্পষ্টভাবে যাকে তখন খুব কামিয়াব দেখা যাচ্ছিল। তা থেকেই তারা জীবনের মূল নীতি গ্রহণ করলো, তারই জ্ঞান শিখলো, তাদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অনুকরণ করলো এবং সর্বস্তরে তাদেরই পথকে অনুকরণ করলো। আস্তে আস্তে ধর্মীয় দলের লোকেরা চার দেয়ালের মধ্যেই নিক্ষিপ্ত হলো, সারা দুনিয়ার মুসলমানদের নেতৃত্বের বাগডোর ও সক্রিয় শক্তিসমূহ এদেরই হাতে এসে গেলো। আর এরা

ছিল আমাদের দ্বীন ধর্মের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও আধুনিক সভ্যতার মানসপুত্র। পরিণাম এই হলো, দু একটি ব্যতীত সব স্বাধীন মুসলিম দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষতার অনুকরণে পরিচালিত হলো। এগুলোর কোথায়ও হয়তো পুরো ইসলামী শরীয়তই তুলে দেয়া হলো, কোথাও মুসলমানদের জন্য তাদের ব্যক্তিগত জীবন পর্যন্ত ইসলামী শরীয়তের অনুমোদন দেয়া হলো। অর্থাৎ মুসলমানদের তাদের নিজ দেশে শুধু ততটুকু ধর্মীয় অধিকার দেয়া হলো, যা একদিন ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা জিম্মীদের প্রদান করতো[১]· এভাবে যে সব দেশ পরাধীন, সে সব দেশেও যাবতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব একই ধরনের লোকদের হাতেই এসে গেল এবং স্বাধীনতার দিকে তাদের যাত্রা যতোই এগুলো ততোই তা এমন স্থানে নিয়ে উপনীত হলো, যেখানে অন্য স্বাধীন দেশসমূহ পূর্বেই পৌছেছে। এখন যদি তাদের কাছে ইসলামী আইন ও ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবী করা হয়, তাহলে এরা তা দমন করতে অনেকটা বাধ্য হয়ে পড়ে, কারণ এদের ইসলামী আইন ও শাসনতন্ত্র সম্পর্কে কোনোই জ্ঞান নেই। যা কিছু তাদের কাছে দাবী করা হলো তার সম্পর্কেও

---

১. ইসলামী শরীয়তকে তুলে দেয়ার কাজ সর্ব প্রথম হিন্দুস্থানে শুরু হয়েছে। এখানে ইংরেজদের কর্তৃত্ব লাভের পরও দীর্ঘদিন পর্যন্ত শরীয়তকেই আইনের ভিত্তি গণ্য করা হতো, এ কারণেই ১৭৯১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দেশে চোরের হাত কাটা হতো, কিন্তু এর পরবর্তি সময়ে ইংরেজরা আস্তে আস্তে ইসলামী আইনের স্থলে অন্য আইন প্রতিষ্ঠা করতে লাগলো, উনবিংশ শতকের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত পৌছতে পৌছতে পুরো শরীয়তই তুলে দেয়া হলো এবং শরীয়তের শুধু সে অংশই মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন হিসেবে রাখা হলো যা বিয়ে তালাক ইত্যাদির সাথে জড়িত। অতঃপর এই পথ ধরে তারাও চলতে লাগলো, যে সব মুসলিম দেশে মুসলমানদেরই শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিলো। হিন্দুস্থানের সব মুসলিম রাজ্যগুলো আস্তে আস্তে নিজেদের আইন–কানুনগুলোকে বৃটিশ ভারতের অনুকরণে পুনর্গঠিত করে নিলো এবং শরীয়াতকে শুধু ব্যক্তিগত আইনেই সীমাবদ্ধ করে দেয়া হলো। ১৮৮৪ সালে মিশর তার পুরো আইন ব্যবস্থাকেই ফরাসী আইনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে দিলো। শুধু বিয়েশাদী তালাক ও মীরাসী আইনের ক্ষেত্রেই কাজীদের অধিকার স্বীকার করা হলো। তারপর বিংশ শতকে আলবেনিয়া ও তুরস্ক আরেকটু অগ্রসর হলো। তারা পরিষ্কার করেই এই কথা ঘোষণা করলো যে, তাদের দেশ ধর্ম বিবর্জিত। তারা নিজেদের আইন–কানুনকে ইটালী, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানীর অনুকরণে ঢেলে সাজিয়েই ক্ষান্ত হয়নি–মুসলমানের ব্যক্তিগত আইনেও এমন সব সুস্পষ্ট পরিবর্তন, পরিবর্ধন করতে শুরু করলো, যার সাহস ইতিপূর্বে কোনো অমুসলিম দেশও করেনি। আলবেনিয়ায় একাধিক বিয়েকে আইনের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো, তুরস্কে তো বিয়ে তালাক ও উত্তরাধিকার আইনে কুরআনের সুস্পষ্ট আদেশ নিষেধকেই লংঘন করা হয়েছে। এরপর শুধু সৌদি আরব ও আফগানিস্তান দুটি রাষ্ট্রই এমন থেকে গেলো, যেখানে শরীয়তের আইনকে রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হলো, যদিও শরীয়তের মূল স্পিরিট সেখান থেকেও অনুপস্থিত ছিলো। (স্মরণীয় যে, প্রবন্ধটি ১৯৪৮ সালে লিখা–অনুবাদক)

তারা কিছু জানে না। যে শিক্ষা ও মানসিক প্রশিক্ষণ তারা পেয়েছে তা তাদেরকে ইসলামী আইনের উৎস ও জীবনী শক্তি থেকে এতো বেশী দূরে নিয়ে গেছে যেখানে থেকে ইসলামী শরীয়তকে বুঝা তাদের জন্য খুব সহজ ছিলো না। অপরদিকে তখন ধর্মীয় নেতাদের নেতৃত্বে দ্বীন শিক্ষার যে ব্যবস্থা এখানে প্রচলিত ছিলো তা সেদিন পর্যন্ত বিংশ শতকের জন্য দ্বাদশ শতকের লোক তৈরীতেই ব্যস্ত ছিল। তাছাড়া এমন কোনো দলও সমাজে তখন বর্তমান ছিলো না যারা পাশ্চাত্যের অনুসারীদের সরিয়ে একটি আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়তে কিংবা চালাতে পারে।

এ ছিলো সত্যিই এমন এক জটিলতা, যা সারা মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আইন ও শাসনতন্ত্রের বাস্তবায়ন করাকে অনেকাংশে একটি কঠিন কাজে পরিণত করে রেখেছে। কিন্তু আমাদের ব্যাপার অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের তুলনায় ভিন্নতর। আমরা এই ভারতীয় উপমহাদেশে বিগত বছরগুলো ধরে এ জন্যই সংগ্রাম করেছি যে, আমাদের একটি স্বতন্ত্র সভ্যতা, একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ এবং জীবনের একটি বিশেষ লক্ষ্য রয়েছে। আমাদের জন্য মুসলমান ও অমুসলমানদের একই জাতীয়তা কোনো অবস্থায়ই গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ তাদের জীবন ব্যবস্থা অবশ্যই আমাদের জীবন লক্ষ্যের সাথে খাপ খাবে না। এ জন্য আমাদের একটি স্বতন্ত্র ভূ-খন্ড দরকার ছিলো, যেখানে আমরা আমাদের স্বকীয় আদর্শ মোতাবেক দেশ গড়তে ও চালাতে পারবো। একটি দীর্ঘ ও কষ্টকর দ্বন্দ্ব সংগ্রামের পর অবশেষে আমরা সে ভূ-খন্ডটি লাভ করেছি, যার জন্য এদ্দিন ধরে আমরা দাবী জানিয়ে আসছিলাম এবং এরই মূল্য পরিশোধ করতে গিয়ে আমাদের লক্ষ লক্ষ মুসলমানদের জানমাল ও ইজ্জত দিতে হয়েছে। এই সব কিছুর পরও যদি এখানে আমরা সেই জীবন লক্ষ্য বাস্তবায়িত না করি, সত্যিকার অর্থে যার জন্য এতো বিরাট মূল্য পরিশোধ করে এই ভূ-খন্ড অর্জিত শাসনতন্ত্রের স্থলে ধর্মহীন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ও ইসলামী আইনের পরিবর্তে যদি ভারতীয় দন্ডবিধি ও ফৌজদারী বিধি-বিধানই জারি করতে হয় তাহলে হিন্দুস্থান কি ক্ষতি করেছিলো যে, তার পরিবর্তে এতো ঝগড়া ফাসাদ করে পাকিস্তান লওয়া দরকার হয়ে পড়লো। যদি আমাদের কর্মসূচী সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠাই হয়, তাহলে এই 'মহান কাজ' তো হিন্দুস্থানের সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট পার্টির সাথে মিলেমিশেই আঞ্জাম দেয়া যেতো। এর জন্যও এমন

কোনো দরকার ছিলো না যে, অযথা এতো প্রানান্তকর সংগ্রাম ও এতো বেশী মূল্য দিয়ে পাকিস্তান অর্জনের বোকামী করার? সত্যিকার কথা হচ্ছে, আমরা একটি জাতি হিসেবে নিজেদেরকে খোদা, খোদার বান্দাহ ও ইতিহাসের কাছে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার জন্য বাধ্য করে নিয়েছি, আমাদের জন্য নিজেদের প্রতিশ্রুতি থেকে ফিরে আসা সম্ভব নয়। তাই অন্যান্য মুসলিম জাতিসমূহ যাই করুক না কেন, আমাদের অবশ্য এসব জটিলতার সমাধান করে নিতে হবে যা এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

ইসলামী আইনের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যে সব সমস্যা দেখা দিতে পারে তার সব কয়টি সম্পর্কেই বলা যায় যে, এগুলো সবই দূরীভূত করার চেষ্টা করা সম্ভব। এগুলোর মধ্যে কোনোটাই আসল সমস্যা নয়। আসল সমস্যা হচ্ছে যে সব মন মস্তিষ্কের চিন্তা সাধনা যারা এই কাজ আঞ্জাম দেবে তারা নিজেরাই এ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত নয়। অবশ্য এর কারণও ইসলামী আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা। এ জন্য আজ সর্বাগ্রে করণীয় কাজ হচ্ছে, তাদের পরিষ্কার করে এ কথা জানিয়ে দেয়া যে, ইসলামী কানুন কাকে বলে, তার প্রকৃতি কেমন, তার লক্ষ্য ও নীতি, তার আভ্যন্তরীণ চরিত্র ও ধরন কেমন, তার মধ্যে কি কি বিষয় স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় এবং এ স্থায়ী হওয়ার মধ্যে কি কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তাছাড়া তার কোন কোন বিষয় চির প্রগতিশীল এবং তা কিভাবে যুগে যুগে আমাদের ক্রমবর্ধমান সাংস্কৃতিক ও সামাজিক চাহিদা পূরণ করতে পারে, তার বিধিসমূহের ভিত্তি কি কি সুবিধের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সে সব ভুল ধারণাগুলোরই বা প্রকৃত অবস্থা কি, যা এ সম্পর্কে সর্বত্র অজ্ঞ লোকদের মধ্যে ছড়ানো হয়েছে। যদি এভাবে সঠিক অর্থে সংশ্লিষ্ট সবাইকে এ কথাগুলো অনুধাবন করানো যায় তবে আমার বিশ্বাস, আমাদের সমাজের সর্বোৎকৃষ্ট ও ক্রিয়াশীল মস্তিষ্কগুলো এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে, তাদের এই মানসিক নিশ্চিন্ততাই সে সব চেষ্টার নতুন দিগন্ত খুলে দেবে, যা ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠাকে বাস্তবে সম্ভব করে তুলবে। এই পরিচিতির জন্যই আমার আজকের এই বক্তৃতা।

আইন ও জীবন বিধানের পারস্পরিক সম্পর্ক

আইন শব্দটি দিয়ে আমরা যা বুঝাই তা মূলতঃ এই প্রশ্নেরই উত্তর যে,

ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে মানুষের কর্মধারা কি হওয়া উচিত? এই প্রশ্নের পরিধি সেই পরিধির চেয়ে অনেক ব্যাপক, যাতে আইন এর জবাব দেয়। আমাদের বিস্তৃত পরিসরে এই 'হওয়া উচিত' প্রশ্নটিরই সম্মুখীন হতে হয়। এর বিভিন্ন জবাব আছে যা বিভিন্ন অধ্যায় ও শিরোনামে গ্রথিত হয়, তার একাংশ আমাদের নৈতিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত এবং এই মোতাবেক আমরা আমাদের ব্যক্তি চরিত্র ও কর্মধারাকে ঢেলে সাজাতে চাই। এরই আরেকটি অংশ আমাদের সামাজিক জীবনের অন্তর্ভুক্ত, এরই আলোকে আমরা আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধরনের মানবীয় সম্পর্কের ভিত্তি নির্ণয় করি, এরই তৃতীয় অংশ আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের সাথে জড়িত, এরই আলোকে আমরা সম্পদ ও সম্পদের আহরণ, উৎপাদন, বিতরণ ও বিনিময় করি এবং এ পর্যায়ের সব কয়জনের অধিকারের নীতি ঠিক করি। মোদ্দা কথা হচ্ছে, এই উত্তরের বেশ কয়টি অংশই এমন তৈরী হয়ে যাবে, যা আমাদের জীবনের বিভিন্ন বিভাগের ধরন ও কর্মসূচী নির্দিষ্ট করে। 'আইন' এই সব কিছুর মধ্যে শুধু ওসব অংশেরই নাম যাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ব্যবহার করতে হয়। এখন যদি কোনো ব্যক্তি আইনকে বুঝতে চায় তাহলে তার চিন্তা ওই সীমাবদ্ধ পরিসরে আটকে রাখা উচিত হবে না, যেখানে আইন 'কি হওয়া উচিত' শুধু এ কথারই জবাব দিয়েছে বরং তাকে সমাজের সেই কর্মসূচী সম্পর্কে জ্ঞানার্জ্জন করতে হবে, যেখানে জীবনের সব কয়টি দিক সম্পর্কেই এই মূল প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। কারণ আইন হচ্ছে সেই সামগ্রিক স্কীমেরই একটা অংশ মাত্র। সামগ্রিকভাবে বিষয়টি অনুধাবন করা ছাড়া বিচ্ছিন্নভাবে শুধু এর ধ্যান ধরন বুঝা কিংবা তার সম্পর্কে কোনো ধারণা পোষণ করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

জীবন বিধানের চৈন্তিক ও নৈতিক ভিত্তি

অতপর জীবনের বিশাল ক্ষেত্রে আমাদের 'কি হওয়া উচিত' এই প্রশ্নে যে জবাব দেয়া হয় তাও মূলতঃ আরেকটি প্রশ্ন অর্থাৎ 'কেন হওয়া উচিত' এর জবাবেরই অংশ মাত্র। অপর কথায় 'কি হওয়া উচিত' সম্পর্কে আমাদের যাবতীয় উত্তরের ভিত্তি বস্তুত সে আদর্শের ওপরই, যা আমরা মানবীয় জিন্দেগী, তার ভালো মন্দ, তার হক ও বাতিল, ঠিক বেঠিক সম্পর্কে পূর্বেই ধারণা করে রেখেছি এবং সে আদর্শের ধরন ঠিক করার কাজে সেই মূল সূত্রের বিরাট একটা

প্রভাব রয়েছে, শুধু প্রভাবই নয় সত্যিকার অর্থে–তাই সিদ্ধান্তকারী শক্তি হয়ে দাঁড়ায় যেখান থেকে আমরা মূল আদর্শকে গ্রহণ করছি। পৃথিবীতে বিভিন্ন মানবীয় গোষ্ঠির আইন কানুনে মতবিরোধ এ জন্য দেখা যায় যে, মানবীয় জীবন সম্পর্কে গৃহীত আদর্শসমূহ তারা একই সূত্র থেকে গ্রহণ করেনি, তাদের সূত্র ছিলো ভিন্নতর। এই মতবিরোধের কারণে তাদের আদর্শও ভিন্নরূপ ধারণ করেছে। আদর্শের বিভিন্নতা তাদের জীবনের স্কীমকেও বিভিন্নমুখী করে দিয়েছে, অতঃপর এই স্কীমের যে অংশ আইনের সাথে সম্পৃক্ত তাও নানামুখী হয়ে পড়েছে, এ অবস্থায় এটা কি করে সম্ভব যে, আমরা জীবনের কোনো একটি স্কীমের মৌল আদর্শ, তার উৎস ও তার থেকে জন্ম নেয়া সামগ্রিক জীবন বিধানকে অনুধাবন করা ছাড়া শুধু তার আইনগত দিকগুলো সম্পর্কেই কোনো ধারণা পোষণ করবো, তাও আবার তার আইনের অংশের বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ করে নয়–তার দু' একটি বিষয় সম্পর্কে কতিপয় উড়া কথার ওপর নির্ভর করে।

আমি এখানে তুলনামূলক পর্যালোচনা (Comparative study) পেশ করার কোনো ইচ্ছা পোষণ করিনা, যদিও এ ব্যাপারটি তখনই সঠিকভাবে বুঝা যাবে, যখন পাশ্চাত্যের জীবন ব্যবস্থাকে–যার আইন কানুন আপনারা পড়েন এবং নিজের দেশে যা জারি করেছেন–ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পাশাপাশি রেখে তুলনামূলকভাবে দেখানো হবে যে, এ উভয়ের মধ্যে কি কি পার্থক্য আছে এবং এই পার্থক্য কিভাবে উভয় আইনকে বিভিন্নমুখী করে দিয়েছে। কিন্তু তা বলতে গেলে প্রসংগ অনেক দীর্ঘায়িত হয়ে যাবে। এ জন্য আমি এখানে শুধু ইসলামী আইনের ব্যাখ্যার ওপরই আলোচন সীমাবদ্ধ রাখবো।

ইসলামী জীবন বিধানের উৎস

ইসলাম যে জীবন বিধানের নাম, তার উৎস একটি গ্রন্থ। যার বিভিন্ন সংস্করণ অতীত যুগে তাওরাত, ইঞ্জিল, জবুর ইত্যাদি বহু নামে দুনিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে। এই কিতাবেরই সর্বশেষ সংস্করণ 'আল কুরআন' নামে মানবতার সামনে পেশ করা হয়েছে। ইসলামের পরিভাষায় এই গ্রন্থের নাম আল্ কিতাব। এছাড়া অন্যান্য নামগুলো (যেমন তাওরাত, জবুর ও ইঞ্জিল) এই গ্রন্থেরই বিভিন্ন সংস্করণের নাম। ইসলামী জীবন বিধানের দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে, সে সব মানুষ যাঁরা যুগে যুগে এই গ্রন্থ নিয়ে মানুষের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন,

যাঁরা নিজেদের কথা ও কাজ দিয়ে এই গ্রন্থেরই উদ্দেশ্য সাধন করেছেন, এঁরা যদিও বিভিন্ন মানুষ হওয়ার কারণে নূহ (আঃ), ইব্রাহীম (আঃ), মুসা (আঃ), ঈসা (আঃ) ও মোহাম্মদ (সঃ) নামে আখ্যায়িত। কিন্তু তাঁরা সবাই ছিলেন একই মিশনের জন্য কর্মতৎপর। তাই তাঁদের 'আর–রসূল' বলে অভিহিত করাটাই হচ্ছে যুক্তিযুক্ত।

ইসলামের জীবন আদর্শ

এই 'আল কিতাব' ও 'আর্ রসূল' জীবনের যে আদর্শ পেশ করেছেন তা হচ্ছে, এই বিশাল সৃষ্টিরাজি, যাকে তোমরা একটি সুস্পষ্ট বিধানের অধীন ও একটি নির্দিষ্ট বিধি মোতাবেক চলতে দেখছো, তা মূলত এক খোদারই রাজত্ব। খোদাই তার স্রষ্টা, খোদাই তার মালিক। তিনিই তার শাসক। এই ভূখন্ড, যার ওপর তোমরা বসবাস করছো তা তার অনন্ত রাজত্বের অসংখ বিভাগেরই একটি ক্ষুদ্র বিভাগ মাত্র। এবং এই বিভাগও কেন্দ্রীয় ক্ষমতার সেই বন্ধনের পুরোপুরি অধীন, যার বন্ধনে গোটা বিশ্বলোকের প্রতিটি অনুপরমাণূ জড়িত। তোমরা এই ভূখন্ডে খোদার জন্মগত দাস। (Bora subjects) তোমরা নিজেরা নিজেদের স্রষ্টা নও–তোমরা সৃষ্টি, নিজেদের প্রতিপালকও তোমরা নিজেরা নও–তোমরা পালিত জীব। তোমরা নিজের শক্তিতে নিজেরা বেঁচে নেই–তিনিই তোমাদের জীবিত রেখেছেন। এ জন্য তোমাদের অন্তরে স্বীয় স্বাধীন সত্ত্বার যদি কোনো ধারণা থাকে তবে তা নিঃসন্দেহে একটি ভুল ধারণা মাত্র, একে বড়ো জোর দৃষ্টিভ্রমই বলা যেতে পারে। জীবনের এক বিশাল অংগে তোমরা স্পষ্টতঃ প্রজা এবং তোমরা তোমাদের এই অবস্থার কথা যে জানো না এমনও নয়। তোমাদের মায়েদের গর্ভে গর্ভ সঞ্চারের দিন থেকে মৃত্যুর শেষ পর্যন্ত তোমরা খোদার প্রাকৃতিক আইনে এমনভাবে বন্দী হয়ে আছো যে, একিট নিঃশ্বাসও তোমরা তার বিরুদ্ধে চালাতে পারো না এবং তোমাদের ওপর প্রাকৃতিক শক্তি ও বিধানসমূহ এমনভাবেই প্রতিষ্ঠিত যে, তোমাদের কিছু করতে হলে তার নিয়ন্ত্রণে থেকেই করতে হবে, এক মুহূর্তের জন্যও তার থেকে মুক্তি লাভ করা তোমাদের জন্য সম্ভব নয়। এখন অবশিষ্ট রইলো তোমাদের জীবনের সে অংশ যে অংশে তোমাদের ইচ্ছার প্রাধান্য চলে, এতে তোমরা তোমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা অনুভব করো এবং নিজের ইচ্ছা মতো ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবনের

কর্মপন্থা বাছাই করণের ক্ষমতা রাখো। হা, অবশ্যই তোমাদের এ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা তোমাদের বিশ্ব চরাচরের আসল মালিকের রাজত্ব বহির্ভূত করে দেয়না। বরং শুধু এটুকু স্বাধীনতা দেয় যে, তোমরা চাইলে আনুগত্যের পথ অবলম্বন করতে পারো যা তোমাদের জন্মগত প্রজা হিসেবেই করা উচিত এবং চাইলে তোমরা এ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও বিদ্রোহের পথও অবলম্বন করতে পারো–যা তোমাদের প্রাকৃতিক সত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে তোমাদের করা উচিত নয়।

সত্যের মৌল ধারণা

এখান থেকেই সত্য সম্পর্কিত প্রশ্নটির উদয় হয়। এবং এটি এমন এক মৌলিক প্রশ্ন, যা জীবনের খুটিনাটি ব্যাপার পর্যন্ত সত্য মিথ্যা ফয়সালা করার কাজে প্রভাব বিস্তার করে। জীবনের সত্য সম্পর্কে যে ধারণা আল–কিতাব ও আর রসূল দিয়েছেন, তাকে একটি শ্বাশত সত্য হিসেবে মেনে নেয়ার পর এই ব্যাপারটিও একটি সুস্পষ্ট সত্য হিসেবে গ্রহণ করতে হয় যে, জীবনের যে অংশে মানুষের ইচ্ছা শক্তি কার্যকর, তাতেও খোদার সার্বভৌমত্বকে মেনে নেবে। কারণ তার জীবনের অপর বিরাট অংশে যেখানে তার ইচ্ছা শক্তির কোনো প্রভাব নেই এবং সৃষ্টিলোকের অন্য সর্বত্র তারই সার্বভৌমত্ব কার্যকরী। তিনি নিজেই সে সার্বভৌমত্বের মালিক। এ ব্যাপারটি কয়েক কারণে সত্য। এটা এ জন্যও সত্য যে, মানুষ যে শক্তি ও প্রকরণ দিয়ে তার ইচ্ছা শক্তিকে বাস্তবায়িত করে তা সর্বাংশে আল্লাহর দান। এ জন্যও সত্য যে, এসব ইচ্ছাও মানুষের অর্জিত কিছু নয়। এ জন্যও সত্য যে, সব কিছুর ওপর এই ইচ্ছাকে মানুষ কার্যকর করে তা সবই আল্লাহর মালিকানাধীন। এ জন্যও সত্য যে, যে দেশে এই ইচ্ছা শক্তি চলে তাও আল্লাহর দেশ। এ কারণেও সত্য যে, বিশ্বলোক ও মানবীয় জীবনের মধ্যে ঐক্য ও সাম্যের দাবীও এই যে, আমাদের জীবনের দুটি অংশ যেখানে আমাদের নিজ ইচ্ছা চলে এবং যেখানে নিজ ইচ্ছা চলেনা উভয়টাই একই মালিকের অধীন ও উভয়টার জন্য একই হেদায়াত ও পদ্ধতি কায়েম থাকবে। এই দু'টি বিভাগের দু'টি স্বতন্ত্র ও পরস্পর বিরোধী লক্ষ্য যদি নির্ধারণ করে নেয়া হয় তাহলে উভয়ের মধ্যে এমন একটি বৈপরিত্ব দেখা দেবে যা শুধু বিশৃংখলারই কারণ হবে। এক ব্যক্তির জীবনে এই বিশৃংখলা হয়তো সীমিত পর্যায়েই প্রকাশিত হবে,

কিন্তু বড়ো বড়ো জাতিসমূহের জীবনে এই বৈপরিত্বের ফলাফল এতো ব্যাপকভাবে দেখা দেয় যে, মারাত্মক বিপর্যয়ই অবধারিত হয়ে পড়ে।

“ইসলাম” ও “মুসলিম”—এর ব্যাখ্যা

আল–কিতাব ও তার উপস্থাপক রসূল (সঃ) মানুষের সামনে এই সত্যকেই পেশ করেন, তাদের প্রতি আহ্বান জানান, তারা যেন কোনো রকম চাপ প্রয়োগ ছাড়াই তা গ্রহণ করে নেয়। কেননা এটা মানবীয় জীবনের ঐ অংশের ব্যাপার, যাতে আল্লাতায়ালা স্বয়ং মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। এ জন্যই এই অংশেও কোনো রকম চাপ প্রয়োগ ছাড়াই তাকে স্বীয় সন্তুষ্টির দ্বারাই এই সত্য মেনে নেয়া উচিত। এই সত্য ঘটনার ব্যাপারে যার মন নিশ্চিত হয় যে, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূল বিশ্ব রহস্য সম্পর্কে যা বলেছেন তাই ঠিক, যার মন একবার সাক্ষ্য দেয় যে, এই সত্য ঘটনা বর্তমান থাকায় প্রকৃত সত্য তাই, যা ঘটনা পরম্পরা দাবী করে, সে তার ইচ্ছা, আযাদী ও স্বকীয়তাকে খোদার সার্বভৌমত্বের সামনে সমর্পণ করে দেয়। এই সমর্পণ করার নামই “ইসলাম”। যারা এইভাবে নিজেকে সমর্পণ করে দেয় তাদের বলা হয় “মুসলিম”। অর্থাৎ এমন লোক, যারা খোদার সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নিয়েছে তার সামনে নিজের ইচ্ছা, শক্তি ও স্বাধীনতাকে সমর্পণ করেছে।সর্বোপরি নিজের জীবনকে খোদার হুকুম মোতাবিক চালানোর জন্য নিজেকে বাধ্য করেছে, সত্যিকার অর্থে এ ধরনের ব্যক্তিই হচ্ছে মুসলিম।

মুসলিম সমাজ কাকে বলে?

এভাবে যারা খোদার কাছে নিজেদের সমর্পণ করেছে তাদের একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজ তৈরী হয়। তাদের একত্রিত হবার মাধ্যমেই মুসলিম সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই সমাজ সে সব সমাজ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর, যে সব সমাজ বিচ্ছিন্ন ঘটনার ফলে সংগঠিত হয়েছে। এই সমাজের সংগঠন একটি ইচ্ছাকৃত ব্যাপার, তার সংগঠনও এমন একটি চুক্তির (Contract) ভিত্তির উপর গঠিত হয়, যা খোদা ও তাঁর বান্দাহদের মধ্যে জেনে শুনেই সম্পাদন করা হয়। এই চুক্তিতে বান্দা একথা মেনে নেয় যে, খোদাই তার শাসক, তার হুকুম আহ্কামই হচ্ছে তার জন্য শাসনতন্ত্র। তাঁর বিধানই তার জন্য আইন। তাকেই সে ভালো মনে করবে যাকে আল্লাহ ভালো বলবেন। ঠিক তাকেই সে খারাপ

মনে করবে যাকে আল্লাহ খারাপ বলে নির্ধারণ করে দেবেন। সত্য-মিথ্যা, জায়েজ না-জায়েজের মাপকাঠি সে খোদার কাছ থেকেই গ্রহণ করবে। স্বীয় স্বাধীনতার গন্ডি ঐ পরিসীমা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখবে যার সীমানা স্বয়ং আল্লাহই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সংক্ষেপে এই চুক্তির ভিত্তিতে যে সমাজ গঠিত হয় তা সুস্পষ্টভাবে এই কথা স্বীকার করে নেয় যে, সে তার জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে 'কি হওয়া উচিত' এর উত্তর সে নিজে নিজে তৈরী করবে না, বরং তার যে উত্তর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঠিক করে দিয়েছেন তাকেই সে গ্রহণ করবে।

এই সুস্পষ্ট ঘোষণার ভিত্তিতে যখন একটি সমাজ তৈরী হয় তখন আল কুরআন ও তার বাহক সে সমাজের জন্য একটি নিয়ম কানুন প্রদান করেন যাকে শরীয়ত বলা হয়। তখন সে সমাজের নিজস্ব ঘোষণা মোতাবেক তার ওপর এটা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে যে, সে তার দৈনন্দিন কার্যাবলীকে সে স্কীম অনুযায়ী চালাবে যা শরীয়ত নির্ধারণ করে দেবে। যতোক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তির জ্ঞান ও বিবেকবোধ লোপ পাবেনা, ততোক্ষণ পর্যন্ত সে কিছুতেই এটাকে সম্ভব মনে করতে পারে না যে, কোনো মুসলিম সমাজ তার মৌলিক চুক্তিকে ভংগ করা ব্যতিরেকে শরীয়ত ছাড়া অন্য কোনো জীবন ধারনের পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে। অন্য কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করার সাথে সাথেই তার মূল চুক্তি আপনা আপনিই বাতিল হয়ে যায়। আর চুক্তি বাতিল হবার সাথেই সে সমাজ 'মুসলিম' থেকে অমুসলিম সমাজে পরিণত হয়ে যায়। বিচ্ছিন্নভাবে কোনো ব্যক্তির জীবনে কোনো একটি ঘটনায় শরীয়তের খেলাফ চলা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস, এতে চুক্তি ভংগ হয় না। অবশ্য একটি মারাত্মক অপরাধেই সে অপরাধী হয়ে পড়ে, কিন্তু একটি পুরো সমাজ যখন জেনে শুনে এই সিদ্ধান্ত করে যে, শরীয়ত এখন তার জীবন প্রণালী নয়, এখন তার নিয়মনীতি সে নিজেই নির্ধারণ করবে। অথবা অন্য কোনো সূত্র থেকেই সে তা গ্রহণ করবে, তবে তা হবে নিঃসন্দেহে চুক্তি ভংগের কাজ, এ অবস্থায় সে সমাজের জন্য 'মুসলিম' শব্দটিকে অপরিহার্যভাবে জুড়ে রাখার কোনো কারণ নেই।

শরীয়তের উদ্দেশ্য ও নীতিমালা

এই মূল কথাগুলোর ব্যাখ্যা করার পর এবার আমাদের সেই স্কীমগুলোও বুঝার চেষ্টা করা উচিত, যা শরীয়ত মানব জীবনের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছে।

এ জন্য প্রয়োজন হচ্ছে সর্বাগ্রে এই উদ্দেশ্য ও তার কতিপয় বৃহৎ নীতিমালার পর্যালোচনা করা।

শরীয়তের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানব জীবনকে মারূফের (ভালোকাজ) ওপর প্রতিষ্ঠিত করা ও মুনকার (মন্দকাজ) থেকে পবিত্র করা। মারুফ বলতে সে সমস্ত নেকী, গুণাবলী ও ভালো কাজকে বুঝায় যাকে মানবীয় প্রকৃতি সর্বদাই ভালো জেনে এসেছে এবং মুনকার দ্বারা ওসব খারাপ কাজই বুঝানো হয় যাকে মানবীয় মন সব সময়ই খারাপ মনে করে এসেছে, অন্য কথায় 'মারূফ' মানবীয় প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং 'মুনকার' তার সুস্পষ্ট বিরোধী।

শরীয়ত আমাদের জন্য সে সব জিনিসকে ভালো বলে গ্রহণ করতে বলে যা খোদার বানানো প্রাকৃতিক বিধানের সাথে সংঘর্ষশীল নয়, অপরদিকে সে সব জিনিসকে মন্দ বলে, যা তার সাথে সংঘর্ষশীল। শরীয়ত এসব ভালো কাজের একটি সূচী তৈরী করে আমাদের হাতে অর্পণ করেই স্বীয় দায়িত্ব শেষ করে নেয়নি–সে জীবনের পুরো স্কীমকেই এমন নকসার ভিত্তিতে তৈরী করতে চায় যার ভিত্তি হবে 'মারূফ' কিংবা ভালো কাজের ওপর। জীবনের পুনর্গঠনের ব্যাপারে মুনকারের সেখানে কোনো স্থান নেই, বরং মানব জীবনের কোনো অংশেই মুনকারকে তার বিষক্রিয়া বিস্তারের সুযোগ দেয়া হবে না।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শরীয়ত মারূফ কাজের সাথে সেসব উপকরণকেও তার স্কীমের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়, যার দ্বারা মূল জিনিসটির কায়েম ও বিকাশ ঘটতে পারে। এবং এ পথে আরোপিত যাবতীয় বিধি নিষেধকেও সে নির্মূল করতে চায়। এভাবে মূল 'মারূফ' কাজের সাথে তার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে পারে এমন সব কার্যাবলীও মারূফের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। একই ব্যাপার সে মুনকারের বেলায়ও গ্রহণ করে, আসল মুনকারের সাথে ওসব জিনিসও তখন মুনকার বলে বিবেচিত হয়, যা কোনো মুনকার কাজের সংগঠন, প্রকাশ ও বিস্তার লাভের ব্যাপারে সাহায্য করে। সমাজের পুরো ব্যবস্থাপনাকে শরীয়ত এমনভাবে ঢেলে সাজাতে চায় যে, এক একটি 'মারূফ' কাজ পূর্ণাঙ্গরূপে কায়েম হবে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার বিকাশ ঘটবে, সব দিকে থেকেই তাকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে সহযোগিতা পাওয়া যাবে। এমন প্রতিটি বাধাই দূরীভূত করা হবে যা এর পথ রোধ করে দাঁড়াবে। এইভাবে এক

এক করে প্রতিটি মুনকারকে সমাজ থেকে খুঁজে খুঁজে উচ্ছেদ করা হবে, তার জন্ম ও বিকাশের উপকরণকে বন্ধ করা হবে, যতোদিক থেকে এটা জীবনে ঢুকে পড়তে পারে ততোগুলো রাস্তাই বন্ধ করা হবে। যদি কোনো কারণে তা মাথা তোলে তাকে কঠোর হাতে দমন করা হবে।

'মারূফ' কাজকে শরীয়ত তিন ভাগে বিভক্ত করে। এক, ফরজ ওয়াজেব, দ্বিতীয় মানদুব অর্থাৎ আকাংখিত, তৃতীয় মুবাহ বা জায়েজ।

১. ফরজ ওয়াজেব ঐসব মারূফকে বলা হয় যাকে মুসলিম সমাজের ওপর আবশ্যকীয় বিষয় করে দেয়া হয়েছে। এসব ব্যাপারে শরীয়ত পরিষ্কার ও অপরিবর্তনীয় আদেশ দিয়েছে।

২. 'মান্দুব' ঐসব মারূফ কাজকে বলা হয় যেগুলো শরীয়ত পছন্দ করে, অপর কথায় শরীয়ত যার সমাজে প্রতিষ্ঠা ও প্রচলন হওয়া প্রত্যাশা করে। এর কিছু কিছু ব্যাপার শরীয়ত পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে। অবশিষ্ট কিছু ব্যাপারে শরীয়তের পক্ষ থেকে ইংগীত প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে এমন কিছু আছে যার বিকাশের সরাসরি ব্যবস্থা করা হয়েছে আবার কয়েকটির ক্ষেত্রে শুধু সুপারিশ করা হয়েছে, যেন সমাজ সামগ্রিকভাবে কিংবা তার ভালো মানুষগুলো এর দিকে আকৃষ্ট হয়।

৩. তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে মুবাহ কিংবা বৈধ 'মারূফ'। শরীয়তের দৃষ্টিতে এমন প্রত্যেকটি জিনিসই জায়েজ, যার ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি। এ ব্যাখ্যার আলোকে মুবাহ কাজ শুধু তাই নয় যার অনুমতির স্পষ্ট বিধান আছে অথবা যার ব্যাপারে আমাদের পরিষ্কার করে কিছু বলে দেয়া হয়েছে। এই আলোকে এর পরিধি অনেক ব্যাপক। এমনকি কয়েকটি বর্ণিত বিধি নিষেধ ছাড়া পৃথিবীর সব কিছুই জায়েজ হয়ে পড়ে, মুবাহর এই ব্যাপক পরিসীমায় শরীয়ত আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছে। এই সীমায় আমরা আমাদের প্রয়োজন মুতাবেক আইন–কানুন কার্যবিধি ও কর্মসূচী নিজেরাই তৈরী করতে পারি।

মুনকার কাজকেও শরীয়ত দুভাগে বিভক্ত করেছে। এক, হারাম অর্থাৎ স্থায়ী নিষেধ, দ্বিতীয় মাকরূহ কিংবা অপছন্দনীয়।

হারাম হচ্ছে সেই মুনকার যা থেকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনকে বিরত রাখা মুসলমানদের ওপর অবশ্য করণীয় এবং শরীয়তে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিধান জারী করা হয়েছে। এর পর আসে মাকরূহ কাজের প্রসংগ। এ ব্যাপারে শরীয়তের পক্ষ থেকে কোনো না কোনো ভাবে– কোথাও সুস্পষ্টভাবে, কোথাও ইশারা ইংগীতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়েছে, যাতে সহজেই একথা বুঝা যায় যে, তা কোন্ পর্যায়ের অপছন্দনীয়। কিছু মাকরূহ কাজ আছে যা হারামের কাছাকাছি, কিছু এমন আছে যাকে জায়েজের কাছা কাছিও বলা যায়, আবার কিছু আছে যার অবস্থান হচ্ছে এর মাঝামাঝি, কিছু আছে যাকে রুখে দাঁড়ানো ও নির্মুল করার ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশ আছে, আবার কয়েক প্রকারের এমন আছে যাকে অপছন্দনীয় বলে রেখে দেয়া হয়েছে যাতে করে সমাজের ভালো মানুষরা মিলে মিশে তার গতিরোধ করতে পারে।

শরীয়তের ব্যাপকতা

মারূফ আর মুনকারের ব্যাপারে এসব বিধি আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সর্বস্তরেই বিরাজিত। ধর্মীয় ইবাদাত, ব্যক্তির কর্মকান্ড, নৈতিক চরিত্র ও অভ্যাস সমূহ, খানা–পিনা কাপড়–চোপড় পরিধান করা, মানুষের উঠা বসা, কথা বার্তা, পারিবারিক জীবন, সামাজিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক ব্যাপার, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার নিয়মাবলী, রাজকার্য চালাবার ধরণ, যুদ্ধ ও সন্ধির নিয়ম, অন্যান্য জাতির সাথে সম্পর্ক, মোট কথা, জীবনের কোনো বিভাগ ও ক্ষেত্র এমন নেই যার সম্পর্কে শরীয়ত আমাদের নেকী–বদীর বিধি, ভালো মন্দের পথ, পবিত্র–অপবিত্রতার পার্থক্যবোধ পরিষ্কার করে দেয়নি। শরীয়ত এর সর্বস্তরে আমাদের একটি সুস্থ জীবন যাপনের পূর্ণ নকসা প্রদান করে, এতে পুরোপুরিভাবে একথা বলে দেয়া হয়েছে যে, সে সব ভালো জিনিস কি যাকে আমাদের প্রতিষ্ঠা করা, তরান্বিত করা ও বিকশিত করা দরকার। আবার কি কি খারাপ জিনিস আছে যাকে আমাদের নির্মূল ও দমন করা দরকার। কোন্ পরিসীমা পর্যন্ত আমাদের কর্মের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করা উচিৎ এবং বাস্তবে আমাদের কোন্ পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন যাতে আমাদের জীবনে বাঞ্ছিত ভালো কাজের প্রসার ঘটে ও মন্দ কাজের সমাপ্তি হয়।

শরীয়তের বিধান অবিভক্ত

জীবনের এই পুরো নকশাটি একটি একক নকশা। তার সামষ্টিক দাবী হচ্ছে, তা বিচ্ছিন্ন হয়ে কায়েম থাকতে পারেনা। তার পারস্পরিক ঐক্য মানুষের শারীরিক অস্তিত্বের ঐকের মতো, আপনি যাকে মানুষ বলেন তা মানুষের একটি পূর্ণাংগ অস্তিত্বের নাম–মানবীয় দেহের কতিপয় বিচ্ছিন্ন ও কর্তিত অংশের নাম নয়। একটি কাটা পা'কে আপনি মানুষের $\frac{১}{৮}$ কিংবা $\frac{১}{৬}$ অংশ বলতে পারেন না। ঠিক একটা কাটা পা' সে সব দায়িত্বের কোনো একটিও পালন করতে পারে না যা মানব দেহের একটি জীবন্ত অংশ হিসেবে মানুষের পা আঞ্জাম দিতে পারতো। না সে কাটা পা'কে আপনি অন্য কোনো জন্তুর শরীরে লাগিয়ে তার কাছ থেকে মানবীয় পায়ের আচরণ আশা করতে পারেন। এভাবেই মানব দেহের হাত, পা, চোখ, নাক ইত্যাদি অংশকে আলাদা আলাদা করে আপনি তার সৌন্দর্য ও উপকারীতা সম্পর্কে কোনো মতামত দিতে পারেন না, যতোক্ষণ পর্যন্ত জীবন্ত শরীরের একটি অংশ হিসেবে তাকে তার কাজ করার সুযোগ না দেবেন ততোক্ষণ পর্যন্ত কিছুই আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন না। শরীয়তের পরিপূর্ণ জীবনের নকশাটির অবস্থাও একই রকম। ইসলাম তার সমস্ত অংশের একক ও সামষ্টিক নাম–বিচ্ছিন্ন অংশের নাম নয়। তার অংশগুলোকে ভাগ করে তার সম্পর্কে কোনো ধারণা পেশ করা ঠিক নয়, না সমষ্টি থেকে আলাদা করে তার কোনো এক দুটি অংশকে কায়েম করে আপনি বলতে পারেন যে, আমি ইসলামের অর্ধাংশ কিংবা এক চতুর্থাংশ ইসলাম কায়েম করেছি। অন্যকোনো জীবন ব্যবস্থার সাথে তার দু'একটি অংশ জুড়ে দিয়েও তার থেকে কোনো কল্যাণকর কিছু হাসিল করা যাবেনা। শরীয়তের বিধান প্রনয়ণকারী এই নকশাটি বানিয়েছেন, যেন পুরোটাই একত্রে কায়েম হতে পারে। কারো ইচ্ছা মোতাবেক তার কোনো একটি বিচ্ছিন্ন অংশকে যখন চাইবে কায়েম করে দেয়া তার উদ্দেশ্য নয়। এর প্রতিটি অংশ একটার সাথে কায়েম করে দেয়া তার উদ্দেশ্য নয়। এর প্রতিটি অংশ একটার সাথে অপরটি এমনভাবে জড়িত যে, এগুলো একত্রে থেকেই কাজ করতে পারে। আপনি এর সৌন্দর্য্য সম্পর্কে তখনি কোনো অভিমত প্রকাশ করতে পারবেন যখন এর সর্বাংশ একত্রে ও পর্যায়ক্রমে তাদের দায়িত্ব পালন করতে থাকবে।

আজ শরীয়তের বিভিন্ন বিধান সম্পর্কে যে ভুল ধারনা লোক সমাজে প্রচলিত আছে তার অধিকাংশের পেছনেই এই কারণটি বিদ্যমান যে, পুরো ইসলাম সম্পর্কে কোনো সামষ্টিক দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে কোনো একটি অংশকে তার থেকে বের করে আনা হয় অথবা তাকে বর্তমান অনৈসলামী জীবন বিধানের আওতায় রেখেই একে কায়েম করার চেষ্টা করা হয়। অথবা সেই বিচ্ছিন্ন অংশকেই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিষয় মনে করে তার ভালো মন্দ সম্পর্কে ফয়সালা করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ ইসলামের ফৌজদারী আইনের কতিপয় ধারা সম্পর্কে আজকের দুনিয়ার বহু লোক নাক ছিটকায়। কিন্তু তাদের একথা জানা নেই যে, যে জীবন বিধানে এই সব ফৌজদারী আইনের ধারা সন্নিবেশিত হয়েছে, তাতে তার সাথে একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, একটি সমাজ ব্যবস্থা, একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও একটি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাও আছে। তার সব কয়টি অংশকে কাজ করতে না দিয়ে শুধু সে আইনের কতিপয় ধারাকে আইনের বই থেকে বের করে এনে বিচারকক্ষে জারী করে দেয়া স্বয়ং সে জীবন বিধানেরও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

অবশ্যই ইসলামী আইন চোরের হাত কাটার শাস্তি দেয়। কিন্তু এই বিধান যেকোনো সমাজে জারী করার জন্যে দেয়া হয়নি। বরং তাকে ইসলামের ওই সমাজেই জারী করার কথা বলা হয়েছে, যেখানে অর্থশালীদের কাছ থেকে জাকাত আদায় করা হবে, যার রাষ্ট্রীয় বায়তুল মাল বিপদ গ্রস্থদের সাহায্যের জন্যে সদা উন্মুক্ত থাকবে, যার প্রতিটি জনপদে মুসাফিরদের জন্যে তিন দিনের মেহমানদারী আবশ্যকীয় করে দেয়া হবে। যে শরীয়তের ব্যবস্থায় সবার জন্যে একই ধরণের অধিকার ও সুবিধে নিশ্চিত করা হয়েছে, যার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কোনো শ্রেণীর অতিরিক্ত সুবিধে–অর্থনৈতিক ইজারাদারীর জন্যে কোনো স্থান রাখা হয়নি, বৈধ রোজগারের যাবতীয় পথই সবার জন্যে খোলা আছে। যার নৈতিক ও শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে খোদাভীতি ও তার সন্তুষ্টির চেতনা সৃষ্টি করবে, যার নৈতিক পরিবেশে দানশীলতা, গরীবদের ব্যাপারে দাক্ষিণ্য, বিপদ গ্রস্থদের সাহায্য ও পতনুমুখ ব্যক্তিদের আশ্রয় দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে, এবং যার প্রতিটি বালককে পর্যন্ত এই শিক্ষা দেয়া হবে– তুমি মুমীন হতে পারবে না, যদি তোমার কোনো প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে। এই

আদেশ আপনাদের বর্তমান সমাজের জন্যে দেয়া হয়নি, যে সমাজে একজন আরেকজনকে সূদ ছাড়া ঋণ পর্যন্ত দেয়না। যে সমাজে বায়তুল মালের পরিবর্তে ব্যাঙ্ক ইনসিউরেন্স কোম্পানী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, যেখানে বিপদ গ্রস্থদের সাহায্য করার হাতগুলো একে একে পেছনমুখী থাকে। যার নৈতিক দৃষ্টিকোণ হচ্ছে, একজনের রোজগারে অপর কারো অধিকার নেই, বরং প্রত্যেকেরই নারী পুরুষ নির্বিশেষে রুটী রুজীর দায়িত্ব তার স্বীয় স্কন্দের ওপর অর্পিত। যার সমাজ ব্যবস্থা শ্রেণী বিশেষকে বিশেষ পার্থক্যসূচক অধিকার দিয়েছে, যার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কিছু ভাগ্যবান ও ধূর্ত লোককে চারদিক থেকে সম্পদ জমা করার সুযোগ দেয়, সর্বোপরি যে সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থা আইনের মাধ্যমে এসব সুযোগপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের স্বার্থই সংরক্ষণ করে চলে। এমন সমাজে চোরের হাত কাটার প্রশ্ন তো আলাদা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভবত, তাদের শাস্তি দেয়াই জায়েজ হবেনা। কেননা এ ধরনের একটি সমাজে চুরিকে অপরাধ বলার অর্থ দাড়াবে স্বার্থবাদী ও অবৈধ অর্থ উপার্জনকারীদের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করা। অথচ এর পরিবর্তে ইসলাম সেই সমাজ ব্যবস্থা তৈরী করতে চায় যাতে 'চুরি করতে বাধ্য' এমন কোনো পরিস্থিতিরই সৃষ্টি হবেনা। প্রত্যেক বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে তার বৈধ প্রয়োজন পূরণ করার জন্যে মানুষ স্বেচ্ছাপ্রনোদিত ভাবেই এগিয়ে আসবে। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেও তার প্রয়োজন পূরণের যাবতীয় ব্যবস্থা থাকবে। এরপরও যদি কোনো ব্যক্তি চুরি করে তখন তার জন্যে ইসলাম হাত কাটার শিক্ষামূলক ও চরম শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। কেননা এমন ব্যক্তি একটি ভদ্র, ইনসাফপূর্ণ ও দয়া দাক্ষিণ্যে ভরা সমাজে বসবাসের যোগ্য নয়।

এ ভাবেই ইসলামী শাস্তির বিধানে ব্যাভিচারের জন্যে একশ' বেত্রাঘাত ও বিবাহিত ব্যাভিচারীর বেলায় প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান প্রদান করে, কিন্তু তা কোন্ সমাজে? ঐ সমাজে, যেখানে পুরো সমাজ ব্যবস্থাকেই যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারক উপকরণসমূহ থেকে পাক করে দেয়া হয়েছে, যে সমাজে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ থাকবেনা, যাতে অশ্লীল অংগ ভংগিতে মেয়েদের রাস্তায় নামা বন্ধ হবে, যাতে বিয়ের ব্যাপারটাকে খুব সহজ করে দেয়া হবে। সর্বোপরি যে সমাজে নেকী, খোদাভীতি ও পবিত্র জীবন যাপনের ব্যাপক সুযোগ থাকবে এবং যার পারিপার্শিকতায় খোদার স্মরণ প্রতি মুহূর্তেই সবার

হৃদয়ে জাগরুক থাকবে। এই বিধান সে নোংরা সমাজের জন্যে নয়, যার চারদিক থেকে মানুষের যৌন অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলার ব্যবস্থা আছে, অলি গলি ও ঘরে ঘরে অশ্লীল গান বাদ্য চলছে, স্থানে স্থানে চিত্রাভিনেত্রীদের নগ্ন চিত্র লটকানো থাকে, শহর ও পল্লীর সর্বত্র সিনেমা শুধু প্রেমের নিত্য নতুন অনুশীলনই প্রদান করে বেড়ায়, অশ্লীল ও নোংরা বই পুস্তক দিব্বি প্রকাশ ও প্রসার লাভ করেছে, কতিপয় নারী তাদের উগ্র যৌন কামনায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, জীবনের প্রতিটি স্তরে যৌন মিলনের সুযোগ বৃদ্ধি করা হচ্ছে এবং সমাজ ব্যবস্থা তার অযথা রসম রেওয়াজের কারণে বিয়েকে কঠিন কাজে পরিণত করে রেখেছে। জানা কথা, এমন সমাজে ব্যাভিচারের শরীয়ত সম্মত শাস্তির বিধান করা হয়নি। এমন সমাজে ব্যাভিচারীকে শাস্তি দেয়ার পরিবর্তে ব্যাভিচার থেকে বিরত থাকার মানুষটিকে বরং কোনো মূল্যবান পুরস্কার অথবা অন্তত বিরোচিত উপাধিই দেয়া উচিৎ।

শরীয়তের আইনগত দিক

এ আলোচনা দ্বারা একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, বর্তমান পারিভাষিক অর্থে শরীয়তের যে অংশকে আমরা আইন নামে আখ্যায়িত করি, তা জীবনের একটা পরিপূর্ণ কর্মসূচীরই অংশ। এটি স্বয়ং সম্পূর্ণ কোনো বিষয় নয় যে, সমষ্টি থেকে আলাদা করে তাঁকে বুঝানো যেতে পারে কিংবা তাকে জারী করা যেতে পারে। যদি তা করাও হয় তবে তা ইসলামী কানুনের প্রতিষ্ঠা হবেনা, তার থেকে সে ফলও পাওয়া যাবেনা যা ইসলাম তার থেকে পেতে চায়। সর্বোপরি শরীয়ত প্রদানকারীরও তা ইচ্ছা মোতাবেক হবেনা। শরীয়তের পুরো স্কীমকে সামষ্টিক জীবনে জারী করা এবং এই স্কীমের পূর্ণাংগ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই ইসলামী আইনকে যথার্থভাবে জারী করা সম্ভব।

শরীয়তের এই স্কীম বাস্তবে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। এর কিছু অংশ আছে, যাকে প্রতিষ্ঠা করা প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির দায়িত্ব। কোনো বাইরের শক্তি তাকে প্রতিষ্ঠা করাতে পারেনা, কিছু এমন আছে, যাকে ইসলাম তার আত্মশুদ্ধি এবং ব্যক্তি চরিত্রের পরিশুদ্ধির কর্মসূচী দিয়ে প্রতিষ্ঠা করাতে চায়। অন্য বিষয়গুলোকে জারী করার ব্যাপারে জনমতের শক্তিকে কাজে লাগায়। সর্বশেষ অংশগুলোকে সে মুসলিম সমাজের মার্জিত সংস্কার হিসেবেই' প্রচলন করাতে

চায়। এই সব কিছুর সাথে একটি বড়ো রকমের অংশ হচ্ছে এমন, যার প্রতিষ্ঠার জন্যে ইসলাম দাবী করে মুসলিম সমাজে নিজেদের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করুক। কেননা তা রাজনৈতিক ক্ষমতা ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা। এই রাজনৈতিক ক্ষমতা শরীয়তের বর্ণিত জীবন বিধানেরই সংরক্ষণ করবে, তাকে ধ্বংশের হাত থেকে রক্ষা করবে, তার চাহিদা মুতাবেক ভালো কাজের বিকাশ ও মন্দের নির্মূল করণের ব্যবস্থা করবে এবং তার সে সব বিধান প্রতিষ্ঠা করবে, যার জন্য একটি বিচার ব্যবস্থাও দরকার।

এই সর্বশেষ বর্ণিত বিষয়টিই হচ্ছে তা, যাকে আমরা ইসলামী আইন নামে অভিহিত করি, যদিও এক হিসেবে পুরো শরীয়তটাই হচ্ছে একটা আইন, কেননা তা প্রজাদের ওপর সার্বভৌম রাজার আদেশেরই সমষ্টি। কিন্তু পারিভাষিক অর্থে আইন বলা হয় এমন সব বিধিকে যার প্রতিষ্ঠার জন্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা অপরিহার্য। এ জন্যে আমরা শরীয়তের সে অংশকেই "ইসলামী আইন" বলি, যাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে সে নিজস্ব নীতি ও মেজাজ মোতাবেক একটি রাজনৈতিক ক্ষমতাও সংগঠিত করে।

ইসলামী আইনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ

১. রাজনৈতিক ক্ষমতা সংগঠনের জন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি শাসনতান্ত্রিক আইনের। শরীয়ত এর সব কয়টি জরুরী মূলনীতিই ঠিক করে দিয়েছে। রাষ্ট্রের মূল আদর্শ কি, তার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য কি, কারা কারা তার নাগরিক হতে পারে, তাদের অধিকার ও কর্তব্যের সীমারেখা কতোটুকু, কিসের ভিত্তিতে একজনকে নাগরিকত্ব অধিকার দেয়া হবে, আবার কি কি কারণে তা রহিত করা হবে, ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য কতোটুকুন, রাষ্ট্রের যাবতীয় আইন ও ক্ষমতার উৎস কি, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কোন মূলনীতির ভিত্তিতে চলবে, প্রশাসনের ক্ষমতা কার হাতে অর্পণ করা হবে, তার নিয়োগ কে প্রদান করবে, কার সামনে তাকে জবাবদিহি করতে হবে, কোণ সীমায় থেকে সে কাজ করবে, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কাকে কতোটুকু দেয়া হবে, বিচারালয়ের অধিকার ও দায়িত্ব কি হবে, শাসনতান্ত্রিক আইনে এই সব মূল প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব শরীয়ত আমাদের প্রদান করেছে। অতঃপর এসব মূলনীতিগুলো পরিষ্কার করে বলে দেয়ার পর শরীয়ত আমাদের এটুকু স্বাধীনতা

দিয়েছে যে, শাসনতন্ত্রের বিস্তারিত স্বরূপ আমরা নিজেরা নিজেদের অবস্থাও প্রয়োজন অনুযায়ী ঠিক করে নিতে পারি। আমরা অবশ্য এজন্যে বাধ্য যে, আমরা আমাদের রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রকে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক তৈরী করবো, কিন্তু কোনো বিস্তারিত শাসনতন্ত্র সর্বকালের জন্যে আমাদের জন্যে দেয়া হয়নি যে, তাতে শাখা প্রশাখায় কোনো রকম সংস্কার করা চলবেনা।

২. রাজনৈতিক ক্ষমতা সংগঠনের পর ইসলামী রাষ্ট্রে তার ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করার জন্যে একটি প্রশাসনিক আইনের প্রয়োজন। এরও সব মৌলিক নীতিগুলো শরীয়ত স্পষ্ট ভাবে ঠিক করে দিয়েছে। তাছাড়া এ ব্যাপারে আমাদের পথ দেখাবার জন্যে মহানবী (সঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের (রাঃ) আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থার উদাহরণ আছে। একটি ইসলামী রাষ্ট্র তার আয়ের জন্যে কি ধরণের পন্থা অবলম্বন করতে পারে এবং কোন্ ধরণের পন্থা অবলম্বন করতে পারেনা, রাষ্ট্রীয় খরচের খাতে কোণ ধরণের খরচ বৈধ, কোণ্ ধরণের খরচ অবৈধ, সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিচারালয় আইন শৃংখলার বিভিন্ন দিকে রাষ্ট্রের দৃষ্টিকোণ্ কি হবে, নাগরিকদের নৈতিক ও বৈষয়িক কল্যাণের জন্যে রাষ্ট্রের ওপর কি কি দায়িত্ব অর্পিত হয়, কোন্ কোন্ ভালো কাজ আছে যাকে নির্মূল ও রুখে দাড়ানো রাষ্ট্রের দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। নাগরিকদের জীবন যাপনের বেলায় রাষ্ট্র কতোটুকু হস্তক্ষেপ করতে পারে? এ সব ব্যাপারে শরীয়ত আমাদের শুধু নীতিগত হেদায়েতই প্রদান করেনা বরং বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে স্থায়ী ও স্পষ্ট বিধানও দিয়েছে। কিন্তু পুরো শাসন ও প্রশাসনের এমন বিস্তারিত কর্মসূচী তৈরী করে আমাদের প্রদান করা হয়নি যে, প্রতি যুগে আমরা তাই মানতে ও কায়েম করতে বাধ্য থাকবো, যার কোনো সামান্য পরিমানও পরিবর্তন করার আমরা অধিকার রাখিনা। শাসনতান্ত্রিক আইনের মতো প্রশাসনিক আইনেও বিস্তারিত বিধি নিষেধ তৈরী করার পূর্ণ স্বাধীনতা আমাদের রয়েছে। অবশ্য এই স্বাধীনতা আমাদের অবশ্যই সেই নীতিমালার পরিসীমার মধ্য থেকে প্রয়োগ করতে হবে, যা শরীয়ত আমাদের জন্যে ঠিক করে দিয়েছে।

(৩) এরপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ আইন কানুন ও ব্যক্তিগত আইনের সেসব অধ্যায়ের প্রসংগ আসে, যা সমাজে আইন শৃংখলা প্রতিষ্ঠার জন্যে একান্ত জরুরী। এ ব্যাপারে শরীয়ত আমাদের এতো ব্যাপক পরিমানে বিস্তারিত বিধি নিষেধ ও

মৌলিক নির্দেশাবলী প্রদান করেছে যে, কোনো যুগেই জীবন যাপনের কোনো পর্যায়েই আমাদের আইনের প্রয়োজন পূরণ করার জন্যে শরীয়তের সীমা পরিসীমার বাইরে যাবার দরকার হবেনা। যে বিস্তারিত বিধি শরীয়ত দিয়েছে, তা এখনো প্রতিটি দেশে ও প্রতি যুগে একই ভাবে নিখুঁতভাবে জারী হতে পারে (অবশ্য জীবনের সামগ্রিক বিধানও–যাতে আপনি এসব জারী করবেন তাকেও ইসলাম মতো চলতে হবে) এবং শরীয়ত এ পর্যায়ে যেসব মৌলিক পথ নির্দেশ দিয়েছে, তা এতো বিশাল ও ব্যাপক যে প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে–জীবন যাপনের কাজে জরুরী আইন কানুন এরই আলোকে প্রণয়ন করা যায়। অতপর যে সব ব্যাপারে শরীয়তের কোনো বিধি পাওয়া যায়না তাতে স্বয়ং শরীয়তেরই নিয়ম অনুসারে ইসলামী রাষ্ট্রের 'মাজলিসে শূরা' ও নির্বাচিত ব্যক্তিরা পারস্পরিক পরামর্শে আইন কানুন তৈরী করার অধিকার রাখে। এভাবে যে সব আইন তৈরী হবে, তাও ইসলামী কানুনেরই একটা অংশ হবে। কেননা তা শরীয়তেরই প্রদত্ত অনুমতির ভিত্তিতে প্রণীত। এ কারণেই ইসলামের প্রথম শতকগুলোতে ফেকাহ শাস্ত্রবিদরা 'এসতেহছান' ও 'মাসালেহে মুরসালাহ' ইত্যাদি শিরোনামে যেসব বিধি প্রণয়ন করেছেন তা পরবর্তি কালে ইসলামী আইনেরই অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

৪. সর্বশেষে আইনের একটি বিশেষ বিভাগ হচ্ছে–আন্তর্জাতিক আইন, একটি রাষ্ট্রকে তার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্যে এর দরকার। এ ব্যাপারে শরীয়ত যুদ্ধ সন্ধি ও নিরপেক্ষতার বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্মসূচী নির্ধারণ করার জন্যে নেহায়াত বিস্তারিত পথ নির্দেশ প্রদান করেছে। যেখানে বিস্তারিত বিবরণ নেই, সেখানে মূলনীতি দেয়া হয়েছে যার আলোকে বিস্তারিত বিধি প্রণীত হতে পারে।

ইসলামী আইনের গতিশীলতা

এই সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আইন শাস্ত্রের যতো দিক ও বিভাগে আজ পর্যন্ত মানুষের ধারণা বিস্তার লাভ করেছে, তার কোনো একটি দিকও এমন নেই যার ব্যাপারে শরীয়ত আমাদের পথ প্রদর্শন করেনি। এ পথ প্রদর্শন কোন ভাবে করা হয়েছে, তার যদি পর্যালোচনা করা হয় তাহলে একথা খুব পরিষ্কার করে বুঝা যাবে যে, ইসলামী আইনে কোন্ কোন্ বিষয় স্থায়ী ও অপরিবর্তণীয় এবং তার এ অপরিবর্তণীয় হওয়ার উপকারই বা

কি, আর কোন্ বিষয় চিরপ্রগতিশীল–এবং এগুলো কিভাবে যুগে যুগে আমাদের ক্রমবর্ধমান সভ্যতা ও সামাজিক প্রয়োজন পূরণ করতে পারে।

এই আইনে যা স্থায়ী কিংবা অপরিবর্তণীয় তা' তিন ভাগে বিভক্ত।

১) স্থায়ী ও সুস্পষ্ট আদেশ যা কুরআন অথবা প্রমানিত হাদীসে প্রদান করা হয়েছে, যেমন মদ, সূদ ও জুয়ার হারাম হওয়া, চুরি, ব্যাভিচার ও ব্যাভিচারের অপবাদের শাস্তি এবং মৃত ব্যক্তির পরিত্যাক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারীদের অংশ।

২) মৌলিক বিধি যা কুরআন কিংবা প্রমাণিত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, প্রত্যেক নেশা করা হারাম বস্তু হারাম অথবা লেন দেন যে সব পন্থায় মুনাফার বিনিময়ে পারস্পারিক সম্মতি ব্যাতিরকে সম্পন্ন হবে তা বাতিল কিংবা 'পুরুষ স্ত্রীদের ওপর ক্ষমতাবান' এই বিধিটি।

৩. এমন কতিপয় সীমা রেখা যা কুরআন ও রসূলের হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, যেন আমরা আমাদের স্বাধীনতার সীমা এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি। এবং কোনো অবস্থায়ই যেনো এই সীমা অতিক্রম না করি, যেনম একাধিক বিয়ের ব্যাপার, একই সময়ে চার স্ত্রী রাখার সীমা, তালাকের জন্যে সংখ্যা তিন এর পরিসীমা অথবা ওসিয়তের জন্যে এক তৃতীয়াংশ সম্পদের সীমা নির্ধারণ করা। ইসলামী আইনের এই স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় ও অবশ্য পালনীয় অংশই সত্যিকার অর্থে তা–যা ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতির চতুঃসীমা ও তার বিশিষ্ট চরিত্র নির্ধারণ করে। আপনি এমন কোনো সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রমাণ পেশ করতে পারবেন না যা তার মধ্যে কিছু অপরিবর্তনীয় বিষয় না রেখে নিজের স্বকীয়তা ও অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে, যদি কোনো সভ্যতার কাছে এমন কোনো কিছু না থাকে বরং সবই যদি থাকে সংশোধনযোগ্য তা হলে সে সভ্যতা মূলত কোনো সভ্যতাই নয়। বরং তাহলো একটি গলিত ধাতু, যাকে প্রতিটি ছাচে ঢেলে সাজানো যায় এবং যে সব সময়ই নিজের রূপ পরিবর্তন করতে পারে। তদুপরি এ সব বিধি বিধান, মূলনীতি ও সীমা রেখা সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ করার পর প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তিই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে, শরীয়ত এমন আদেশ যেখানেই দিয়েছে, যেখানে মানুষের সিদ্ধান্তকারী শক্তি ভুল করে 'মারূফ' থেকে সরে যেতে পারে, এমন আশংকা বিদ্যমান থাকে, এমন সব ব্যাপারে শরীয়ত স্পষ্ট আদেশ দিয়ে অথবা খোলাখুলি নিষেধ করে

কিংবা মূলনীতি বর্ণনা করে অথবা সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছে, এ যেনো পথের পাশে দাঁড় করিয়ে দেয়া একটি চিহ্ন স্তম্ভ। এর উদ্দেশ্য, আমরা যেন বুঝতে পারি সঠিক পথ কোনটি? এই চিহ্নগুলো আমাদের প্রগতির ও উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক নয় বরং আমাদের সহজ সরল পথে পরিচালিত করে। আমাদের চলার পথকে পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এসব স্থায়ী বিধি বিধানের একটি নির্ভরযোগ্য অংশ এমন আছে, যার ব্যাপারে গতকাল পর্যন্ত এই পৃথিবীর মানুষেরা আপত্তি উথাপন করে আসছে। কিন্তু আজ আমাদের দেখাদেখি ও দীর্ঘ দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে গতকালকের সেসব বিরোধীদেরও এখন এসব কিছুর সমর্থক বানিয়ে দিয়েছে। এবং এসব আইনের সত্যতা সম্পর্কে তারাও এখন অনেকটা একমত। উদাহরণ স্বরূপ আমি শুধু এখানে ইসলামের বৈবাহিক আইন ও উত্তরাধিকার আইনের দিকে ইংগিত প্রদানই যথেষ্ট মনে করছি।

এই স্থায়ী ও অটল বিষয়ের সাথে দ্বিতীয় আরেকটি উপাদান এমন আছে যা ইসলামী আইনে অপরিসীম ব্যাপকতা সৃষ্টি করেএবং তাকে যুগের যাবতীয় পারিবর্তনশীল অবস্থায় প্রগতিশীল করে দেয়। এগুলো আবার কয়েক ভাগে বিভক্ত।

১. বিধিসমূহের ব্যাখ্যা অর্থাৎ কোনো আদেশ যে ভাষায় দেয়া হয়েছে তার উদ্দেশ্য অনুধাবন ও তার লক্ষ্য নির্ধারণ করার চেষ্টা করা। এটা ফেকা শাস্ত্রের বিশাল এক অধ্যায়। আইনের প্রজ্ঞা ও এব্যাপারে বুৎপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা যখন কুরআন হাদীসের ব্যাপারে গবেষণা করেন তখন তারা শরীয়তের স্পষ্ট আদেশগুলোতেও একাধিক ব্যাখ্যা দেখতে পান। এবং তাদের সবাই নিজ নিজ জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে কোনো একটি ব্যাখ্যাকে দলিল প্রমানের ভিত্তিতে আরেকটি ব্যাখ্যার ওপর স্থান দেন। এই ব্যাখ্যার মতদ্বৈত্যতা আগের দিনেও উম্মতের জ্ঞানী লোকদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো আজো হতে পারে, ভবিষ্যতেও এপথ উন্মুক্ত থাকবে।

২. কেয়াস অর্থাৎ যে ব্যাপারে কোনো পরিষ্কার আদেশ পাওয়া যায় না, সে ব্যাপারে এমন আদেশ প্রদান করা, যা তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো ব্যাপারে আগেই দেখা হয়েছে।

৩. ইজতেহাদ অর্থাৎ শরীয়তের মৌলিক বিধি নিষেধ ও সামগ্রিক

হেদায়াতকে অনুধাবন করে তাকে এমন সব ব্যাপারে প্রয়োগ করা যাতে পূর্বের কোনো সামাঞ্জস্যপূর্ণ উদাহরণ পাওয়া যায় না।

৪. ইসতেহসান অর্থাৎ জায়েজ কার্যক্রমের অসীম পরিসরে প্রয়োজন মতো এমন আইন ও বিধি তৈরী করা, যা ইসলামের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার ও মূলসত্বার সাথে বেশী পরিমাণ সামঞ্জস্যশীল হবে।

এই চারটি বিষয় এমন, যার বিপুল সম্ভাবনা সম্পর্কে যদি কেউ চিন্তা ভাবনা করেন তাহলে তিনি এই সন্দেহে পড়তে পারেন না যে, ইসলামী আইন কখনো মানবীয় সভ্যতার ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন ও পরিবর্তনশীল অবস্থার জন্যে অপর্যাপ্ত হতে পারে। কিন্তু একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, এই ইজতেহাদ, ইসতেহসান, তাবীর ও কিয়াস কোনোটাই ইচ্ছে করলেই যে কোনো ব্যক্তি শুরু করে দিতে পারে না। আপনি প্রতিটি চলমান ব্যক্তিরই এই অধিকার স্বীকার করতে পারেন না যে, সে দেশের বর্তমান আইনের কোনো একটি ধারা উপধারা সম্পর্কে স্বীয় সিদ্ধান্ত জারী করে দেবে। এজন্যে আইনের শিক্ষা ও মস্তিষ্কের গঠনের একটি বিশেষ পরিমাপকে আপনিও আবশ্যকীয় বলে স্বীকার করবেন, যার ওপর পুরোপুরি দখল না থাকলে বাইরের কাউকে আইন সম্পর্কে কথা বলার যোগ্য মনে করা হয়না। এভাবে ইসলামী আইনের ব্যাপারেও মতামত দেয়ার অধিকার একমাত্র তাদের আছে যারা এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা হাসিল করেছে। ইসলামী বিধি বিধানের ব্যাখ্যার জন্যে প্রয়োজন–সেই ভাষার মাধুর্য সম্পর্কে জ্ঞান হাসিল করা, যে ভাষায় তা প্রদান করা হয়েছে, ওই অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকেফ হাল হওয়া যে অবস্থায় প্রথম এ আদেশটি নাযিল করা হয়েছে। কোরআনের বাচনভংগী ও হাদীসের বিশাল সগ্রহ সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া দরকার। কেয়াসের জন্যে কেয়াস করনেওয়ালা ব্যক্তিকে আইনের সুক্ষ্ম অনুভূতি সম্পর্কে এতোটুকু সজাগ হতে হবে, যেন এক ব্যাপারকে অন্য কিছুর ওপর কেয়াস করার সময় উভয়ের পারস্পরিক সামঞ্জস্যের বিভিন্ন দিকগুলোকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে, নতুবা এক আদেশকে দ্বিতীয় আদেশের ওপর সংস্থাপন করতে গিয়ে সে ভুল ভ্রান্তি থেকে বাঁচতে পারবেনা। ইজতেহাদের জন্যে শরীয়তের হুকুম আহকামে গভীর পর্যবেক্ষণ ও দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলীর উৎকৃষ্ট জ্ঞান–শুধু সাধারণ জ্ঞানই

নয়–বরং ইসলামী দৃষ্টিভংগীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ইসতেহসানের জন্যেও অপরিহার্য্য হচ্ছে, ইসলামের মেজাজ ও তার সামগ্রিক বিধি সম্পর্কে ভালোভাবে জানা, যেন বৈধ কার্যক্রমের বিশাল ক্ষেত্রে যে বিধি সে প্রণয়ন করবে তাকে ওই জীবন বিধানের মধ্যেই খাপ খাওয়ানো যায়। এই জ্ঞানগত মানসিক যোগ্যতার পাশাপাশি আরেকটি বিষয়ও দরকার, যার অবর্তমানে ইসলামী আইনের সঠিক ক্রমন্নোতি কখনো সঠিক পথে চলতে পারেনা। তাহচ্ছে যারা একাজ করবেন তাদের মধ্যে ইসলামকে অনুসরণ করার আকাংখা খোদার কাছে জবাবদিহীর অনুভূতি বিদ্যমান থাকবে। একাজ তাদের জন্যে নয়–যাদের দৃষ্টি খোদা ও আখেরাত থেকে বেপরোয়া হয়ে শুধু দুনিয়াবী সুবিধা ও সুযোগের প্রতি নিবন্ধ থাকে এবং ইসলামী মূল্যবোধের পরিবর্তে ভিন্ন কোনো সভ্যতার মূল্যবোধের প্রতি অধিক পরিমাণ আকৃষ্ট হয় এবং তাকে বেশী পছন্দ করে; এ ধরনের লোকদের হাতে ইসলামী আইনের উন্নতি হতে পারেনা–শুধু তার অপব্যাখ্যাই হতে পারে।

কতিপয় অভিযোগ ও তার জবাব

এদেশে ইসলামী আইন জারী করার কথা বললে সাধারণতঃ যেসব অভিযোগ উথাপিত হয় এবার আমি সেসব অভিযোগ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করবো। এসব অভিযোগের সংখ্যা অনেক। কারণ এগুলো বলার সময় সবাই প্রাণ খুলে ভাষা প্রয়োগ করে। কিন্তু পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে আসল অভিযোগ শুধু চারটি।

১. ইসলামী আইনের ‘পুরানো’ হওয়ার অভিযোগ

প্রথম অভিযোগ হলো, শতাব্দীর পুরানো আইন বর্তমান যুগের একটি সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্যে কি ভাবে উপযোগী হতে পারে?

যাদের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ পেশ করা হয়, আমার সন্দেহ হচ্ছে, তাদের ইসলামী আইন সম্পর্কে প্রাথমিক ও মোটামুটি ধারনাও নেই। সম্ভবতঃ তারা কোথায়ও এই উড়া খবরটি শুনেছেন যে, এই আইনের মৌলিক নীতিগুলো সাড়ে তেরশ বছর আগে বিবৃত হয়েছে। এরপর তারা এই কথাই ধরে নিয়েছেন যে, সে সময় থেকে এই আইন সেই একই অবস্থায় রাখা হয়েছে। সেই ভিত্তিতেই তাদের মনে এ আশংকা জন্মেছে যে, আজ যদি কোনো আধুনিক রাষ্ট্র তাকেই দেশের আইন হিসেবে মেনে নেয়, তাহলে তা কিভাবে তার উপযোগী হতে পারে। তাদের একথা জানা নেই যে, সাড়ে তেরশ’ বছর আগে যে মূলনীতি দেয়া হয়েছিলো তার ওপর ভিত্তি করে তখন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থাও কায়েম হয়েছিলো। অতঃপর দৈনন্দিন জীবনে যেসব প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সেসব ব্যাপারে আইন ব্যবস্থা কেয়াস ইজতেহাদ ও ইসতেহসানের (এগুলোর আগে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে) মাধ্যমে এই আইনের গতিশীলতা সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে। অতঃপর ইসলামী মূল্যবোধ ব্যাপক হয়ে পৃথিবীর অর্ধেকের চেয়ে বেশী সভ্য দুনিয়ায় বিস্তার লাভ করেছে। এর পর যতো রাষ্ট্রই পরবর্তি বারশ’ বছর মুসলমানরা কায়েম করেছে তার সব কয়টির প্রশাসনসহ যাবতীয় ব্যবস্থা এই আইনের ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়েছে। যুগে যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এই আইনেও ক্রমান্বয়ে ব্যাপকতা এসেছে। উনবিংশ শতক পর্যন্ত এই আইনের গতিশীলতা এক দিনের জন্যও বন্ধ হয়নি। অন্যদের কথা আলাদা,

আপনাদের এই দেশেই উনবিংশ শতকের প্রথমাংশ পর্যন্ত এই বিধানে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন চালু ছিলো। এখন বড়ো জোর এক দেড়শ বছর সম্পর্কে আপনি বলতে পারেন যে, এই সময়টাতে ইসলামী আইনের বাস্তব প্রয়োগ বন্ধ ছিলো এবং এই সময়েই এই আইনের গতি বন্ধ হয়ে আছে। কিন্তু প্রথম কথা হলো, এই সময়টা কোনো বিরাট সময় নয়। সামান্য পরিশ্রম করেই এ সমস্যা আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি। তাছাড়া আমাদের কাছে এ পর্যায়ে প্রত্যেক শতাব্দীর ফেকাহ শাস্ত্রবিদদের যাবতীয় পদক্ষেপের রেকর্ড বর্তমান আছে, যা দেখে আমরা জানতে পারি, আমাদের পূর্ববর্তি ব্যক্তিরা এ ক্ষেত্রে এযাবত কি কি কাজ করেছেন এবং একে এ যুগের সাথে মিলানোর জন্যে আর কি কি কাজ আমাদের করতে হবে। অতঃপর যেসব নীতিমালা অনুসরণ করে আইনে বার বার গতিশীলতা আনয়ন করা হয়েছে, তা দেখে যে কোনো জ্ঞানী ব্যক্তিই এ ব্যাপারে সন্দেহই পোষণ করতে পারবেন না। যে ভাবে গত বারশ' বছরে এই আইন যুগ ও অবস্থার প্রয়োজনে ব্যাপকতা লাভ করেছে, সেভাবে আজও করতে পারে, আগামী দিনগুলোতেও এভাবে তার প্রসার হতে থাকবে। মুর্খ লোকেরা না জেনে হাজার প্রকার ধোকার শিকার হতে পারে কিন্তু যারা এই আইন সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারনা রাখে, যারা সম্ভাবনা বুঝে, যারা ইতিহাসের ধারণা সম্পর্কেও ওয়াকেফহাল, তারা এক মুহূর্তের জন্যেও এই সংকীর্ণতার শিকার হতে পারে না।

২. বর্বরতার অভিযোগ

দ্বিতীয় অভিযোগ যা জনসাধারণের কাছে নরম সুরে এবং আলাপ আলোচনার বৈঠকে খুব ধৃষ্ঠতা সহকারে বলা হয় তাহলো, ইসলামী আইনের বহু কিছু মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন চিন্তাধারারই ফসল, একে কিভাবে বর্তমান যুগের উন্নত চিন্তাধারা বরদাস্ত করতে পারে? উদাহরণ স্বরূপ হাতকাটা, বেত্রাঘাত ও পাথর মেরে হত্যা করার মতো নির্মম শাস্তি সমূহের কথা উথাপন করা হয়।

এ অভিযোগ শুনে এসব ব্যক্তিদের বলতে ইচ্ছে হয় – সাহেব! আর নিজেদের পবিত্রতার কাহিনী বলতে হবেনা, এক বারের জন্যে নিজের চেহারার দিকেও দেখুন। নিজের অভ্যন্তরের কুৎসিত ছবিখানিও দেখুন। যে যুগে আপনাদের

দ্বারা এটম বোম আবিষ্কৃত হয়েছে, যে যুগের নৈতিক চিন্তাধারাকে উন্নত বলতে আপনাদের মনে লজ্জার অনুভূতি জাগা দরকার। আজকের (নামকা ওয়াস্তে) সুসভ্য মানুষেরা অন্য মানুষদের সাথে যে আচরণ করছে তার নজীর পুরনো যুগের কোনো অন্ধকার দিনেও পাওয়া যাবেনা। এরা পাথর মেরে মানুষ হত্যা করে না–এরা বোমার দ্বারা মানুষের গোটা জাতিকেই ধ্বংস করে। শুধু হাতই কাটেনা তার শরীরের সর্বাংশ বিনষ্ট করে দেয়। বেত্রাঘাতে তার মন ভরেনা–তারা জীবন্ত আগুনে তাকে জ্বালিয়ে দেয়, মৃত লাশ থেকে চর্বি বের করে তা দিয়ে সাবান বানায়–যুদ্ধের উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থায়ই নয়–সুস্থ পরিবেশেও যাকে তারা রাজনৈতিক অপরাধী, জাতীয় স্বার্থের দুশমন অথবা অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে তাদের নির্মমভাবে শাস্তি দেয়ার তারা কোন্ কাজটুকু বাকী রেখেছে? অপরাধ প্রমানিত হবার আগে শুধু অনুসন্ধানের জন্যেও অপরাধ স্বীকার করানোর জন্যে আজকের সুসভ্য মানুষরা যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাও কারো অজানা নয়। এই সব কিছুর সাথে এই উন্নত চিন্তাধারা মানুষের হাতে মানুষের অত্যাচারিত হওয়ার ব্যাপারটা সহ্যই করতে পারে না। অথচ ব্যাপারটা তা নয়। আজ শুধু অত্যাচারই সহ্য করছেনা, জঘন্যতম ও নিষ্ঠুরতম অত্যাচারও তাদের সামনে অহরহ ঘটছে। অবশ্য পার্থক্য এসেছে শুধু নৈতিক মূল্যবোধে। তারা যাকে মারাত্মক অপরাধ মনে করেন তার জন্যে যথেষ্ট শাস্তির বিধান করেন। যেমন, তাদের রাজনৈতিক শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করা, তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থে প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া। আবার যে অপরাধকে তারা সত্যিকার অর্থে অপরাধই মনে করেনা তার ওপর শাস্তি দূরে থাক সামান্য কোনো তিরস্কারও তারা বরদাস্ত করেনা। আর যেহেতু এটা তাদের কাছে অপরাধই নয়–তাই এর জন্যে শাস্তি বিধানও তাদের কাছে অসহনীয়। যেমন মদ খেয়ে কিছু তৃপ্তি (?) লাভ করা অথবা এমনি রিক্রিয়েশনের জন্য ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়া।

এখন আমি সে সব অভিযোগ উত্থাপন কারীদের জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনারা কোণ্ নৈতিক মূল্যবোধ স্বীকার করবেন, ইসলামের নৈতিক মূল্যবোধ না বর্তমান সভ্যতা প্রদত্ত এই মারাত্মক ও তথাকথিত মূল্যবোধকে? যদি আপনাদের মূল্যবোধ বদলে গিয়ে থাকে, যদি ইসলাম প্রদত্ত হালাল হারাম, সত্য মিথ্যা ও নেকী বদীর মাপকাঠি পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে থাকে অথবা

আপনারা তা যদি ছেড়ে দিয়ে অন্য কিছু গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে ইসলামের পরিমন্ডলে আপনাদের স্থানই বা কোথায় যে আপনি সে ব্যাপারে কথা বলবেন, আপনার স্থান তখন মিল্লাতের ভেতরে নয়–বাইরেই হবে। আপনি আপনার মিল্লাত আলাদা তৈরী করে নিন, নিজের জন্যও অন্য কোনো নাম ঠিক করুন এবং পরিস্কার করে বলে দিন যে, ইসলামকে একটি জীবন ব্যবস্থা হিসেবে আমরা পরিত্যাগ করেছি। যে খোদার নির্ধারিত শাস্তির বিধানসমূহকে আপনি বর্বর ও নিষ্ঠুর বলছেন, তার ওপর ঈমান আনার জন্য আপনাকে কোন্ নির্বোধ পরামর্শ দিচ্ছে? কোন নির্বোধ ব্যক্তিই এটা চাইবে যে আল্লাহকে মুর্খ বলার পরও আপনি তার ওপর ইমান আনবেন।

৩. ফেকাহ শাস্ত্রের মতবিরোধের অভিযোগ

তৃতীয় এই অভিযোগ করা হয় যে, ইসলামে তো অনেক ফের্কা আছে এবং সব ফের্কারই স্বতন্ত্র 'ফেকাহ' আছে। যদি এখানে ইসলামী আইন জারি করার সিদ্ধান্ত করা হয় তাহলে কোন ফের্কার ফেকাহ' কার্যকর হবে?

অন্যান্য অভিযোগের মধ্যে এই অভিযোগটি সম্পর্কেই ইসলাম বিরোধীরা বেশী আশাবাদী। তারা মনে করে যে, শেষ পর্যন্ত এই অভিযোগই মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করে ইসলামের বিপদকে' (?) এড়ানো যাবে। এমনকি মুসলমানদের মধ্যে যেসব লোক প্রকৃত সত্য সম্পর্কে সচেতন নয় তারাও এ প্রশ্নে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন যে, এই জটিলতা শেষতক কিভাবে সমাধান হবে? অথচ তাদের অনেকেই জানেনা যে, এটা কোনো জটিলতাই নয়। বিগত বারশ' বছরে কখনো কোথাও ইসলামী আইনের প্রতিষ্ঠাকে এ জটিলতা রুখতে পারেনি।

সর্বাগ্রে এটা বুঝে নিন যে, ইসলামী আইনের মৌল কাঠামো যা খোদা ও তাঁর রসূল (সঃ) কর্তৃক নির্ধারিত তা স্থায়ী বিধান, কতিপয় মূলনীতি ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা–এগুলো প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত একই ধরনের স্বীকৃত ছিলো, এসব কিছুতে কোনো মত বিরোধ না অতীতে ছিলো, না বর্তমানে আছে। ফেকাহর মতে বিরোধ যা আছে তা সবই বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা, কেয়াস ও ইজতেহাদী সমস্যার ব্যাপারে। সর্বোপরি তারও এক বিরাট অংশ হচ্ছে জায়েজের পরিসীমার ভেতর। তাছাড়া এসব মতবিরোধের ধরনও জানা দরকার। কোনো

আলেম যদি শরীয়তের বিধানের ব্যাখ্যা পেশ করেন, কেনো ইমাম স্বীয় ইজতেহাদ ও কেয়াসের বলে কোনো সমস্যার সমাধান করেন কিংবা কোনো মুজতাহিদ যদি ইসতেহসানের ভিত্তিতে কোনো বিষয়ে ফতোয়া প্রদান করেন, তা সাথে সাথেই ইসলামী রাষ্ট্রের আইনে পরিণত হয় না। মূলত তার ধরন হচ্ছে একটি প্রস্তাবের মতোই, আইনে পরিণত হয় তখন, যখন তার ওপর যুগের ফকীহদের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা তাদের অধিকাংশ তাকে গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেন এবং তার ওপরই ফতোয়া প্রদত্ত হয়। আমাদের ফেকাহ শাস্ত্রবিদরা যখন ফেকাহর কেতাবে কোনো মাসয়ালা বর্ণনা করে লিখেছেন যে 'এর ওপর ঐকমত্য স্থাপিত হয়েছে কিংবা এর ওপর অধিকাংশের মত পাওয়া গেছে' তখন তার অর্থ হলো, এই মতামত এখন আর শুধু প্রস্তাব আকারেই নেই, এটি এখন সর্বসম্মত কিংবা অধিকাংশের সম্মতিতে আইনে পরিণত হয়েছে।

এই সর্বসম্মত অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে প্রণীত ফায়সালাও আবার দু'প্রকার। এক হচ্ছে, ওসব বিষয় যাতে সর্বকালের সকল ফকীহদের ঐক্যমত ছিলো, অথবা মুসলিম দুনিয়ার অধিকাংশই তাকে সর্বদাই গ্রহণ করেছে। দ্বিতীয় হচ্ছে, সে বিষয়ে কোনো যুগের বিশেষ কোনো দেশের মুসলমানদের ঐক্যমত স্থাপিত হওয়া কিংবা তাদের অধিকাংশের মতের ভিত্তিতে ঐক্যমত স্থাপিত হওয়া।

প্রথম ধরনের ফায়সালা, যদি তা সর্বসম্মত হয় তবে তাতে দ্বিতীয় বার পর্যালোচনা করা যাবে না, তাকে সকল মুসলমানদের আইন হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে। যদি তা অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে স্থিরীকৃত হয়, তবে দেখতে হবে আমরা যে দেশে ইসলামী আইন জারি করতে চাই তার অধিকাংশ লোক একে গ্রহণ করে কিনা, যদি গ্রহণ করে তবে তাই দেশের আইনে পরিণত হবে। কেউ বলতে পারেন এতো বিগত দিনের ফেকাহ্‌র মাসয়ালার ব্যাপরেই প্রযোজ্য, ভবিষ্যতে কি হবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে যে সব সমস্যা আসবে তাতে–তাবীর, কেয়াস, ইজতেহাদ ও ইসতেহসান যাই হোক, আমাদের দেশের দায়িত্বশীল, যাদের হাতে সমস্যাসমূহের সমাধানের ভার ন্যাস্ত থাকবে তাদের সার্বিক মতামতের ভিত্তিতে কিংবা তাদের অধিকাংশের মতের

ভিত্তিতে ফায়সালা হবে এবং সে ফায়সালাই দেশের আইনে পরিণত হবে। আগেও সব মুসলিম দেশের ফতোয়া দেশের সব কিংবা অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে তৈরী হতো। আজও এ পথটি কার্যকরভাবে চলতে পারে। আমি বুঝি না গণতান্ত্রিক মূল নীতির ভিত্তিতে এছাড়া আর কি বিষয়ের প্রস্তাব করা যেতে পারে? এখন প্রশ্ন হলো, মুসলমানদের মধ্যে যারা অধিকাংশের সাথে ঐক্যমত পোষণ করবেনা তাদের অবস্থা কি হবে? এর জবাব হচ্ছে, এ ধরনের স্বল্প সংখ্যক লোকের দল নিজেদের ব্যক্তিগত আইনের সীমা পর্যন্ত নিজেদের মতামতের ফেকা প্রচলন করার দাবী জানাতে পারে এবং তাদের এ দাবী অবশ্যই মানা উচিত/ কিন্তু রাষ্ট্রের আইন তাই হবে যার ওপর অধিকাংশ লোকের ঐক্যমত থাকবে। আমি বিশ্বাস করি, আজ মুসলমানদের কোনো ফের্কাই এ মুর্খতাজনিত কথা বলবে না যে, যেহেতু রাষ্ট্রের ইসলামী আইনের সাথে আমরা একমত হলামনা তাই এখানে কুফরী আইন চালু করা হোক। ইসলামের কতিপয় শাখা প্রশাখার মতবিরোধ করে মুসলমান কুফরী আইনে ঐক্যমত পোষণ করা এমন একটি বাহুল্য কথা যা কয়েকজন কুফরঘেঁষা ব্যক্তির কাছে যতোই প্রিয় হোকনা কেন, তাকে মুসলমানদের কোনো ফের্কাই মানার জন্য এগিয়ে আসবে না।

৪. অমুসলমান সংখ্যালঘুদের সমস্যা

সর্বশেষ অভিযোগ উত্থাপন করা হয়, এই দেশে শুধু মুসলমানই বাস করে না অমুসলিমও যারা এদেশে বাস করে, তারা কিভাবে এটা মেনে নেবে যে, তাদের ওপর মুসলমানদের ধর্মীয় আইন জারি করা হবে।

এই অভিযোগ যারা পেশ করেন, তারা মূলত এই সমস্যাটিকে ওপর থেকেই পর্যবেক্ষণ করেছেন, তারা পুরোপুরি তা অনুসন্ধান করে দেখেননি, এ জন্য তাদের কাছে বিষয়টিকে খুব জটিল মনে হয়, অথচ সামান্য চেষ্টা করলে সমস্ত গিট এমনিই খুলে যায়। জানা কথা, আমরা যে আইন সম্পর্কে কথা বলছি, তা রাষ্ট্রের আইন কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত আইন নয়। মানুষের ব্যক্তিগত আইনের ব্যাপারে এ কথা বলা যায় এবং তা স্বীকৃত সত্যও যে, সেখানে তাদের আইনই চলবে। এই অধিকার সবার আগে ও সব চাইতে সুন্দরভাবে ইসলামই তার অমুসলিম অধিবাসীদের প্রদান করেছে বরং সত্য কথা হচ্ছে ইসলামই দুনিয়ায় সর্ব প্রথম মানুষকে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত আইনের পার্থক্য শিখিয়েছে।

আধুনিক দুনিয়ার আইনবেত্তারাও এ মূলনীতি ইসলামের কাছ থেকেই শিখেছেন। তারা এই মূলনীতিও শিখেছেন যে, যে দেশের অধিবাসীরা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, তাদের সব লোকের ব্যক্তিগত ব্যাপার ব্যক্তিগত আইনের ভিত্তিতেই চলবে। অতএব অমুসলিম নাগরিকদের তো এ আশংকাই হওয়া উচিত নয় যে, আমরা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমাদের ধর্মীয় আইন জারি করে দেবো। এবং এ ক্ষেত্রে আমরা আমাদেরই প্রতিষ্ঠিত নিয়মের বিরোধিতা করবো যার ব্যাপারে ইসলাম আমাদের সুস্পষ্ট বিধান দিয়ে দিয়েছে।

এখন শুধু প্রশ্ন এই থেকে যায়, এই দেশের রাষ্ট্রীয় আইন কোন্‌টি হবে, ইনসাফের দৃষ্টিতে এই প্রশ্নের জবাব এই ছাড়া আর কি হতে পারে, রাষ্ট্রীয় আইন তাই হবে যা এদেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য। সংখ্যালঘুরা তাদের তাদের বৈধ অধিকার অবশ্যই আমাদের কাছে চাইতে পারে, আর আমরা তাদের চাইবার আগেই তা দিতে চাই। কিন্তু তারা কিভাবে এটা দাবী করেন যে, আমরা তাদের খুশী করার জন্য আমাদের আকীদা বিশ্বাসকে অস্বীকার করবো এবং এমন কোনা আইনকে আমাদের হাত দিয়েই জারী করবো, যাকে আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করিনা। যতো দিন পর্যন্ত আমরা আমাদের দেশে স্বাধীন ছিলাম না ততোদিন পর্যন্ত আমাদের বাধ্যতামূলকভাবে বাতিল আইনকে সইতে হয়েছে, তার দায়িত্ব থেকে আমরা মুক্ত হতে পারিনি। কিন্তু এখন যখন দেশের শাসনব্যবস্থা আমাদের নিজেদেরই হাতে, এখন যদি আমরা জেনে বুঝে ইসলামী আইনের স্থলে অন্য কোনো আইন জারী করি, তখন তার অর্থ হবে, আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলাম পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যাচ্ছি। সত্যই কি কোনো অমুসলিম দলের এ অধিকার আছে যে, তাদের খুশীর জন্য আমরা আমাদের দ্বীন ধর্ম সব পরিবর্তন করে নেবো। কোনো সংখ্যালঘুর কি ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো সংখ্যাগুরুর কাছে এই দাবী পেশ করা সংগত যে, তারা তাদের মতামতের ভিত্তিতে যা সত্য মনে করবে তাকে বর্জন করবে এবং তাই গ্রহণ করবে যাকে সংখ্যালঘুর লোকেরা সত্য বলে বিশ্বাস করবে অথবা এটা কি কোনো যুক্তি সংগত নিয়ম, যে দেশে বিভিন্ন ধর্মের লোক বসবাস করবে তাদের সবাইকে ধর্মহীন হয়েই থাকতে হবে। যদি এসব প্রশ্নের জবাব হাঁ–বোধক হয় তবে আমি বুঝি না যে, একটি মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ দেশের রাষ্ট্রীয় আইন ইসলামী আইন হবে না কেন? (তরজমানুল কুরআন, জুলাই–১৯৪৮ইং)

ইসলামী আইন কোন্ পন্থায় কার্যকর হতে পারে[১]

ইসলামী আইন কাকে বলে, তার আভ্যন্তরীণ পরিচয় কি, তার উদ্দেশ্য ও মূলনীতিসমূহ কি, মুসলমান হওয়ার কারণে তার সাথে আমাদের সম্পর্ক কি, আমরা কেন আমাদের দেশে তাকে প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য, তাছাড়া ওসব সন্দেহ ও অভিযোগের মূল্যইবা কি যা এ ব্যাপারে সাধারণত পেশ করা হয়। এসব বিষয়ের আলোচনা ইতিপূর্বে আমি আপনাদের সামনে পেশ করেছি। সেটা ছিলো অনেকটা পরিচিতিমূলক বক্তব্য। এবার আমি একটু বিস্তারিতভাবে এই বিষয়ে আলোচনা করতে চাই যে, আমরা যদি সত্যই এ দেশে ইসলামী আইনকে নতুনভাবে চালু করতে চাই তাহলে আমাদের কি কি কাজ করতে হবে?

তড়িৎ বিপ্লব সম্ভব নয়—বাঞ্ছিতও নয়

এ পর্যায়ে সর্বাগ্রে আমি সে ভুল ধারণাটি দূরীভূত করতে চাই যা ইসলামী আইন প্রচলনের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষের মনেই বাসা বেধে আছে। মানুষ যখন শুনে যে, আমরা এখানে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে চাই এবং সে রাষ্ট্রে আইন হবে ইসলামী আইন, তখন তারা ধারণা করে যে, সম্ভবতঃ রাষ্ট্রের পরিবর্তনের ঘোষণার সাথে সাথে অতীতের সমস্ত আইন রহিত হয়ে যাবে এবং ইসলামী আইন একই দিনে জারী করে দেয়া হবে। এই ভুল ধারণা শুধু সাধারণ লোকদের মধ্যে নয়–বহু ধর্মীয় জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরাও এই রোগে ভুগছেন। তাদের কাছে ব্যাপারটি এমন হওয়া উচিত যে, এদিকে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম হবে ওদিকে সাথে সাথেই অনৈসলামী আইনসমূহের প্রচলন বন্ধ করা হবে এবং রাতারাতি ইসলামী আইন জারী করে দেয়া হবে। সত্যিকার কথা হচ্ছে, এরা কথাটি বুঝতে পারে না যে, কোনো দেশের আইনের সাথে সে সমাজের নৈতিক, সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গভীর সংযোগ থাকে। তাদের এটাও জানা নেই যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত কোনো দেশের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন না হয় ততোক্ষণ পর্যন্ত সেই দেশের আইন ব্যবস্থার পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব। তাদের এ ধারণাও নেই অতীতের দেড় দুশ' বছর

---

[১] ১. ১৯৪৮ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারী লাহোর ল'কলেজে প্রদত্ত বক্তৃতা

আমাদের ওপর যে ফিরেঙ্গী শাসন কায়েম ছিলো তা কিভাবে আমাদের পুরো জীবন-ব্যবস্থাকে ইসলামী মূলনীতি থেকে দূরে সরিয়ে অনৈসলামী ব্যবস্থার ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এখন আবার তাকে পরিবর্তন করে অন্য মূলনীতির ওপর চালানোর জন্য কতো পরিশ্রম, কতো প্রচেষ্টা ও কতো সময়ের প্রয়োজন? এরা বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল নয়। এজন্য সামগ্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তনকে একটি ছেলেখেলা মনে করে–এ যেন হাতে সরিসা ভাঙ্গানোর স্বপ্ন। অতঃপর এদের এসব কথাবার্তা মূল ধারণাকে হাস্যস্পদ করে ও তার অনুসারীদের ছোট করার সুযোগই এনে দেয়। এই সুযোগ তারাই লাভ করে যারা ইসলামী জীবন বিধান থেকে পালিয়ে বেড়াবার পথ খোঁজে।

ধীরে চলার নীতি

যদি সত্যিই আমরা আমাদের এ কল্পনাকে সফল দেখতে চাই, তাহলে আমাদের প্রকৃতির সে স্থায়ী নিয়ম থেকে গাফেল হলে চলবে না যা সামগ্রিক জীবনে যতো পরিবর্তনই আসুক তা আস্তে আস্তেই আসে। বিপ্লব যতো দ্রুত ও একমুখী হবে, তা ততো অস্থায়ী ও নড়বড়ে হবে। একটি স্থীর ও স্থায়ী বিপ্লবের জন্য এটা অবশ্যই জরুরী যে, জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে পুরোপুরি ভারসাম্য বজায় থাকবে, তার একটি বিভাগ আরেকটি বিভাগের পরিপূরক হয়ে কাজ করবে।

নবী যুগের আদর্শ

এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে মহানবীর (সঃ) সে বিপ্লব, যা তিনি আরবে কায়েম করেছিলেন। যে ব্যক্তি মহানবীর (সঃ) কীর্তি সম্পর্কে সামান্যতম ধারণাও রাখে, সে জানে যে, তিনি পুরো ইসলামী আইন তার সমস্ত বিভাগসহ একদিনে জারী করেননি বরং তিনি সমাজকে সে জন্য আস্তে আস্তে তৈরী করেছিলেন। এই প্রস্তুতির সাথে সাথে পুরানো জাহেলী নিয়মাবলীকে পরিবর্তন করে তার জায়গায় নতুন নতুন ইসলামী বিধান স্থাপন করেছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও নৈতিক বিধানসমূহ মানুষের কাছে পেশ করেছেন। অতপর যারা তা গ্রহণ করেছে, তাদের তিনি প্রশিক্ষণ দিয়ে এমন একটি সুস্থ দল গঠন করেছেন, যাদের মন মানসিকতা, দৃষ্টিভংগী ও কার্যপ্রণালী

ছিলো পূর্ণ ইসলাম মোতাবেক। এই কাজটি যখন একটি বিশেষ সীমায় এসে পূর্ণতা লাভ করেছে তখন তিনি যে দ্বিতীয় পদক্ষেপ নিলেন তা হচ্ছে মদীনায় এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, যার ভিত্তি ছিলো খালেস ইসলামী আদর্শের ওপর এবং যার উদ্দেশ্যই ছিলো দেশের মানুষের জীবনকে ইসলামী ধাঁচে গড়ে তোলা। এভাবে রাজনৈতিক শক্তি ও দেশীয় সম্পদকে হাতে নিয়ে মহানবী (সঃ) ব্যাপক পরিসরে সংশোধন ও পুনর্গঠনের সে কাজ শুরু করলেন, যার জন্য তিনি এতোদিন পর্যন্ত শুধু দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমেই প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তিনি একটি সুসংহত ও সুসংগঠিত উপায়ে মানুষদের চরিত্র, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি পরিবর্তনের চেষ্টা করলেন, শিক্ষার এক নতুন ব্যবস্থা কায়েম করলেন যা সে সময়ের পরিস্থিতি মোতাবেক বেশীর ভাগ মৌখিক শিক্ষার মাধ্যমেই চলতো। জাহেলী চিন্তাধারার পরিবর্তে ইসলামী চিন্তাধারা তার ওপর উপস্থাপন করলেন, পুরাতন রসম রেওয়াজের জায়গায় সংস্কারমূলক নতুন রসম ও শিষ্টাচার চালু করলেন এবং এই ব্যাপক সংস্কারের ফলে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে একদিকে আস্তে আস্তে পরিবর্তন সূচিত হতে লাগলো। তিনি তার পাশাপাশি অত্যন্ত ভারসাম্যমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে ইসলামী আইনের বিধিসমূহ জারি করতে থাকলেন। এভাবেই ৯ বছরের মধ্যে একদিকে জাহেলী যুগের পরিবর্তে ইসলামী জীবন গঠন পূর্ণতা পেলো, অন্যদিকে ইসলামী আইনও দেশে জারী হয়ে গেলো।

কুরআন ও হাদীসের সুক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের দ্বারা আমাদের কাছে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তিনি এ কাজটি কি ধীর পদ্ধতিতে করেছেন। উত্তরাধিকার আইন তৃতীয় হিজরীতে জারি করা হয়েছে, বিয়ে তালাকের আইন ৭ম হিজরীতে গিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে, ফৌজদারী আইন কয়েক বছর পর্যন্ত এক এক ধারা করে জারী করা হয়েছে, ৮ম হিজরীতে গিয়ে তা পূর্ণ হলো। মদ্য পান নিষিদ্ধ করার পরিবেশ আস্তে আস্তে তৈরী করা হলো, ৫ম হিজরীতে তার ওপর স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হলো, সূদের ক্ষতি সম্পর্কে যদিও মক্কার জীবনেই পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছিলো, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হবার সাথে সাথেই তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়নি। বরং দেশের পুরো অর্থ ব্যবস্থাকে যখন পরিবর্তন করে একটি নতুন পদ্ধতিতে সাজানো হয়েছে তখন ৯ম

হিজরীতে গিয়ে তার ওপর পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়। এ কাজটি ছিলো ঠিক একজন নির্মাতার কাজের মতো, নির্মাতা তার সামনে তার প্লান মতো প্রাসাদ বানানোর কারিগর ও মজদুর জমা করলেন, উপায় উপরকণ একত্রিত করলেন, মাটিকে সমান করলেন, ভিত্তি স্থাপন করলেন, অতপর তার ওপর এক একটি ইট রেখে প্রাসাদকে বাড়াতে থাকলেন। এভাবেই কয়েক বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে শেষ পর্যন্ত সেই প্রাসাদ পূর্ণাংগভাবে নির্মিত হলো–যে প্রসাদের কাঠামো একদিন তার চিন্তার রাজ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ ছিলো।

ইংরেজ যুগের উদাহরণ

মাত্র কিছুদিন আগের কথা, আমাদের দেশে যখন ইংরেজদের রাজত্ব কায়েম হলো, তখন কি তারা এক মুহূর্তেই এখানকার সমস্ত আইন কানুন পরিবর্তন করে দিয়েছে? তাদের রাজত্বের পূর্বে ছয় সাত শ' বছর পর্যন্ত এখানকার পুরো জীবন বিধান ইসলামী ফেকার ভিত্তিতেই পরিচালিত হতো। এই শতাব্দীর জমানো প্রাসাদকে ভেঙ্গে দেয়া ও পাশ্চাত্যের নীতি ও আদর্শ মোতাবেক একটি দ্বিতীয় ধরনের প্রাসাদ তৈরী করা এক দিনের কাজ ছিলো না। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, ইংরেজ রাজত্ব স্থাপিত হওয়ার পরও দীর্ঘদিন পর্যন্ত এখানে ইসলামী ফেকাহ চালু ছিলো। বিচারালয়সমূহে কাজীরাই বসে বিচার করতেন, ইসলামের আইন তখনো শুধু ব্যক্তিগত আইনের পর্যায়েই সীমাবদ্ধ ছিলো না, তা রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে কয়েম ছিলো। ইংরেজদের এখানকার আইন কানুনকে পরিবর্তন করতে এক শত বছর সময় লেগেছিলো। তারা আস্তে আস্তে এখানকার ব্যবস্থা পরিবর্তন করে নিজের উদ্দেশ্য মোতাবেক মানুষ তৈরী করেছে। নিজ চিন্তাধারার ব্যাপক প্রচারের ফলে মানুষের চিন্তাধরার পরিবর্তন এসেছে, শাসন ক্ষমতার প্রভাব দ্বারা মানুষের চরিত্র বদলে দিয়েছে। নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দ্বারা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তন করেছে। এভাবে তারা এক এক করে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রভাবের দ্বারা এখানকার সামগ্রিক জীবনকে একদিকে পরিবর্তিত করতে থাকলো এবং পুরানো আইন রহিতকরে নতুন আইন প্রতিষ্ঠা করতে লাগলো।

ধীরে না চলে উপায় নেই

এখন যদি আমরা এখানে ইসলামী আইন জারী করতে চাই, তাহলে আমাদের জন্যও ইংরেজদের শত বছরের তৎপরতাকে মুছে দেয়া এবং তার ওপর নতুন নকশা স্থাপন করা একটি কলমের খোচায়ই সম্ভব নয়।

আমাদের পুরনো শিক্ষা ব্যবস্থা দীর্ঘ দিন যাবৎ জীবন ও তার সমস্যা থেকে সম্পর্কবিহীন থাকার কারণে এমন প্রাণহীন হয়ে পড়েছে যে, তার থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে হাজারেও এমন একজন পাওয়া যাবেনা, যিনি একটি আধুনিক ও উন্নত রাষ্ট্রের জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট হতে পারেন। অপরদিকে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা যে মানুষ তৈরী করছে, তারা ইসলাম ও তার আইন কানুন সম্পর্কে বিলকুল অজ্ঞ এবং তাদের মধ্যেও এমন লোকের সংখ্যা নেহায়াত কম, যাদের মানসিকতা কমপক্ষে এই শিক্ষা ব্যবস্থার বিষ প্রভাব থেকে মুক্ত আছে। অতঃপর এক দেড়শ বছর স্থবির থাকার ফলে আমাদের আইনের সম্পদসমূহও যুগের গতি থেকে বেশ কিছু পেছনে পড়ে গেছে এবং তাকে বর্তমান যুগের বিচার ব্যবস্থার উপযোগী বানানোর জন্যে যথেষ্ট পরিশ্রম দরকার। সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে, দীর্ঘ দিন যাবৎ ইসলামী প্রভাব মুক্ত ও ইংরেজ প্রভাবে প্রভাবাধীন থাকতে থাকতে আমাদের চরিত্র, সমাজ, সভ্যতা, মানসিকতা, অর্থনীতি ও রাজনীতির চেহারাই মূল ইসলামী নকশা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। এ অবস্থায় দেশের আইন ব্যবস্থাকে এক মুহূর্তে বদলে দেয়া– যদি এটা সম্ভবও হয়–সুফলদায়ক হতে পারেনা। কেননা এ অবস্থায় জীবনের অন্যান্য দিকের সাথে আইনের অপরিচিতি ক্ষেত্রে বিশেষে সংঘর্ষই চলবে। এবং এই ধরণের আইনকে পরিবর্তন করে দেয়ার ওই পরিনাম হবে যা এমন একটি বীজের হতে পারে, যাকে বিপরীতমুখী আবহাওয়ায় এমন জমিনে লাগানো হয়েছে যার ধরন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। অতএব, যে পরিবর্তন আজ আমরা চাই, তার পরিবর্তন নৈতিকতা, সমাজ ব্যবস্থা, সভ্যতা, সংস্কৃতি অর্থনীতির পরিবর্তনের সাথে ভারসাম্য বজায় রেখেই করতে হবে।

একটি মিথ্যে অজুহাত

আস্তে আস্তে অগ্রসর হবার এ যুক্তিসংগত ও নির্ভুল নীতিকে অজুহাত বানিয়ে যারা এ কথার সপক্ষে যুক্তি প্রমান পেশ করেন যে, এখানে আসলে

বিধর্মী বরং সঠিক অর্থে ধর্ম বিবর্জিত রাষ্ট্রই কায়েম হওয়া দরকার। অতঃপর যখন ইসলামী পরিবেশ তৈরী হবে তখন ইসলামী রাষ্ট্র এমনিই কায়েম হয়ে যাবে, এরা পরবর্তি সময় ইসলামী কানুনও জারী করে দেবে। তারা সত্যিই একটি অযৌক্তিক কথা বলেন। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করবো এই পরিবেশ কে তৈরী করবে? একটি ধর্মহীন রাষ্ট্র? যার নেতৃত্ব ফিরিঙ্গী মানসিকতাসম্পন্ন লোকদের হাতে। যে নির্মাতা একটি পানশালা ও মদ্যশালা বানাতে জানেন এবং তাতে আগ্রহও পোষণ করেন–তাকে দিয়ে মাসজিদ তৈরী করা হবে? যদি তারা এই বুঝাতে চান, তাহলে এটা মানব ইতিহাসের সর্বপ্রথম অভিজ্ঞতা হবে যে, ধর্মহীনতাই ধর্মের উৎকর্ষ সাধন করে, তার জন্যেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। যদি তাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন কিছু হয়, তবে তারা খোলাখুলি এ কথার ব্যাখ্যা পেশ করুন যে, ইসলামী পরিবেশ তৈরীর এই কাজ কোণ্ শক্তি, কোন্ উপায়ে করবে এবং এ সময়ে বেদ্বীন রাষ্ট্র ব্যবস্থা তার উপায় উপকরন ও ক্ষমতাকে কোন কাজে ব্যয় করবে?

একটু আগে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়ার নীতি প্রমাণ করার জন্যে যে সব উদাহরণ আমি পেশ করেছি, তাকে আপনারা আরেকবার মনে মনে স্মরণ করুন, তাহলে দেখতে পাবেন ইসলামী কিংবা অনৈসলামী জীবন বিধানের প্রতিষ্ঠা–ধীরে ধীরে না করে উপায় নেই। কিন্তু আস্তে আস্তে এর গঠন শুধু এভাবেই হতে পারে যে, যখন একটি নির্মাতা শক্তি তার সামনে একটি কাঠামো ও একটি উদ্দেশ্য নিয়ে একাধারে এ জন্যে কাজ করতে থাকবে। প্রথম দিকে যে ইসলামী বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে তা এভাবেই হয়েছে। নবী (সঃ) কয়েক বছর ধরে তার উপযোগী লোক তৈরী করেছেন, শিক্ষা ও প্রচার দ্বারা মানুষের চিন্তাধারা পাল্টে দিয়েছেন। রাষ্ট্রের সমস্ত প্রশাসন ও ব্যবস্থাকে সমাজের সংস্কার ও একটি নতুন সমাজ সৃষ্টির জন্যে কাজে লাগিয়েছেন এবং এভাবেই সে পরিবেশ তৈরী হলো, যাতে ইসলামী আইন জারী করা সম্ভব হয়েছে। নিকট অতীতের হিন্দুস্থানে ইংরেজরা জীবন পদ্ধতিতে যে পরিবর্তন সাধন করেছে তাও এভাবেই হয়েছে। রাষ্ট্রের চাবিকাঠি এমন লোকদের হাতে ছিলো, যারা এই পরিবর্তনের প্রত্যাশী ছিলো এবং তার জন্যে দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করে শেষ পর্যন্ত এখানকার পুরো জীবন ব্যবস্থাকে সেই ধাঁচে ঢেলেই সাজালো, যা তাদের নীতি ও আইনের সাথে

সম্পৃক্ত ছিলো। এখন আমাদের ইপ্সীত পরিবর্তন কি এমন শক্তিশালী নির্মাতা ব্যতিত সম্ভব অথবা এমন নির্মাতাদের হাতে হবে যারা নিজেরা এই নতুন কাঠামো মতো প্রাসাদ তৈরী করতে জানেনা, তেমন আগ্রহীও নয়।

সঠিক কর্মপন্থা

আমি বুঝি, আশাকরি প্রত্যেক বিবেকবান মানুষই আমার সাথে ঐক্যমত পোষণ করবেন যে, যখন পাকিস্তান ইসলামের নামে ও ইসলামের জন্যে হাসিল করা হয়েছে এবং তার ভিত্তিতেই আমাদের এই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপিত হয়েছে, তখন আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেই সেই নির্মাতার শক্তি হওয়া উচিৎ, যে শক্তি ধীরে ধীরে ইসলামী জিন্দেগী গঠন করবে, আর যখন এটা আমাদেরই দেশ. যাবতীয় জাতীয় উপায় উপকরণ যদি আমরা এরই জন্যে উৎসর্গ করি, তখন কোনো কারণ নেই যে, এই দেশ গঠনের জন্যে কারিগর অন্য কোনো সূত্র থেকে আমাদের তালাশ করতে হবে।

একথাকে সঠিক ধরা হলে এই গঠনের পথে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ হবে, আমরা আমাদের রাষ্ট্রকে সর্ব প্রথম মুসলমান বানানো– যা এখনো ফিরিঙ্গীদের ছেড়ে যাওয়া কুফরী ভিত্তি সমূহের ওপর চলছে। এবং তাকে মুসলমান বানাবার আইনগত পদ্ধতি হলো, আমাদের গণপরিষদ রীতিমতো এই ঘোষণা প্রদান করবেঃ

১. এ দেশের সার্বভৌমত্ব একমাত্র খোদার। রাষ্ট্র তার প্রতিনিধি হিসেবে দেশের শাসন ব্যবস্থা চালাবে।

২. রাষ্ট্রের মৌলিক আইন হবে খোদার সেই শরীয়ত, যা হযরত মুহম্মদ (সঃ)–র মাধ্যমে আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে।

৩. অতীতের সমস্ত আইন যা শরীয়তের সাথে সংঘর্ষশীল, তাকে আস্তে আস্তে বদলাতে হবে এবং ভবিষ্যতে শরীয়ত বিরোধী কোনো আইন বানানো হবেনা।

৪. রাষ্ট্র তার ক্ষমতার ব্যবহার ও প্রয়োগে শরীয়তের পরিসীমা অতিক্রম করার অধিকারী হবে না।

এই হচ্ছে সেই 'কালেমায়ে শাহাদাত' যাকে আইনগত কণ্ঠ অর্থাৎ গণপরিষদের মাধ্যমে আদায় করে আমাদের রাষ্ট্র মুসলমান হতে পারে।

এই ঘোষণার পরই সত্যিকার অর্থে আমাদের ভোটাররা এটা জানতে পারবেন যে, এখন তাদের কোন উদ্দেশ্যে ও কি কাজের জন্যে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে হবে। জনগণ যতো অজ্ঞই হোক না কেন, তাদের এতটুকু বুঝ অবশ্যই আছে যে, তাদের কোন কাজে কোনদিকে ধাবিত হতে হবে এবং তাদের মধ্যে কোন লোক কোন উদ্দেশ্যের জন্যে যোগ্য। তারা এমন বোকা তো নয় যে, চিকিৎসার জন্যে উকীল ও মামলা পরিচালনার জন্যে ডাক্তার অনুসন্ধান করবে। তারা এমন লোকদেরও কোনো না কোনো ভাবে জানে যে, তাদের মধ্যে ঈমানদার ও খোদাকে ভয় করার লোক কে কে আছে। ধূর্ত ও দুনিয়ার পুজারীই বা কে, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী বদ লোক কে, তাও তারা জানে। যে ধরনের উদ্দেশ্য তাদের সামনে থাকে তেমন মানুষই তারা নিজদের মধ্য থেকে বের করে নেবে। এখন পর্যন্ত তাদের সামনে এই উদ্দেশ্যই উপস্থাপন করা হয়নি যে একটি দ্বীনী ব্যবস্থা চালানোর লোক এখন তাদের প্রয়োজন। কেনই বা তারা তেমন লোক তালাশ করবে? যেমন ধর্মহীন ও নীতি বিবর্জিত দেশে প্রচলিত ছিলো। তার চাহিদা মোতাবেক লোকদের ওপরই তার নির্বাচনী দৃষ্টি নিপতিত হয়েছে, তাদেরই ভোটাররা জনগণের মধ্য থেকে বাছাই করে পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন যদি আমাদের একটি ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র বানাতে হয়,মানুষের সামনে এর প্রশ্ন রাখা হয় যে, এই কাজের জন্যে তোমাদের উপযুক্ত লোক পাঠাতে হবে, তাহলে তাদের বাছাই যদিও পূর্ণাংগ নির্ভূল হবেনা, তবুও একথা বলা যায় যে, একাজের জন্যে তাদের দৃষ্টি ফাসেক, ফাজের ও পাশ্চাত্যের মানসিক গোলামদের ওপর নিবিষ্ট হবেনা। তারা এ কাজে সেসব মানুষই অনুসন্ধান করবে যারা নৈতিক, মানসিক ও জ্ঞানমূলক কাজের জন্যে যোগ্য।

রাষ্ট্রকে মুসলমান বানানোর পর ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ হলো, গণতান্ত্রিক নির্বাচন দ্বারা এই রাষ্ট্রের নেতৃত্ব এমন সব লোকদের হাতে অর্পন করা–যারা ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এবং সে জীবন পদ্ধতিকেও ইসলাম অনুযায়ী গঠন করতে আগ্রহশীল হবে।

তারপর তৃতীয় পদক্ষেপ হচ্ছে, সামগ্রিক জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের সংশোধনের জন্যে একটি পরিকল্পনা প্রনয়ণ করবে এবং তাকে বাস্তবায়িত করার জন্যে রাষ্ট্রের সব উপায়–উপকরনকে নিয়োজিত করবে। শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে হবে, রেডিও–প্রেস–সিনেমার সমস্ত শক্তিকে মানুষের চিন্তাধারার পরিশুদ্ধি এবং একটি নতুন ইসলামী মানসিকতা সৃষ্টির কাজে লাগাতে হবে। সমাজ সভ্যতাকে নতুন ধাঁচে ঢেলে সাজাবার জন্যে বিরামহীন প্রচেষ্টা চালাতে হবে, সিভিল সার্ভিস, পুলিশ, জেলখানা আদালত ও সেনাবাহিনী থেকে আস্তে আস্তে এমন লোকদের বের করে দিতে হবে, যারা ফাসেকী ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে এবং এমন নতুনদের কাজের সুযোগ দিতে হবে যারা সার্বিক সংশোধনের কাজে সাহায্যকারী হতে পারে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে হবে, তার যে কাঠামো এতোদিন পুরনো হিন্দুয়ানী ও ফিরিঙ্গী পদ্ধতির ওপর চালু আছে, তাকে উৎখাত করতে হবে। আমি বিশ্বাস করি, যদি একটি সুস্থ ও জ্ঞান সম্পন্ন দল ক্ষমতাসীন হয় এবং দেশের সমস্ত উপায়–উপকরণের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এভাবে সুচিন্তিত পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ করতে শুরু করে, তাহলে দশ বছরের মধ্যে এই দেশের সামগ্রিক জীবনের রূপ বদলে যেতে পারে। একদিকে ধীরে ধীরে এই পরিবর্তন হবে, অপর দিকে পূর্ণ ভারসাম্যের সাথে পুরনো আইনের সংশোধন ও রহিত করণের পাশাপাশি ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার কাজও চলবে। এতে করে জাহেলিয়াতের কোনো আইনই আমাদের দেশে অবশিষ্ট থাকবেনা এবং ইসলামের কোনো একটি আইনও অপ্রতিষ্ঠিত থাকবেনা।

ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার জন্যে গঠনমূলক কাজ

এবার আমি বিশেষ ভাবে ওসব গঠনমূলক কাজের কিছু বিবরণ পেশ করবো, যা দেশের প্রচলিত আইন ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করা ও তার স্থলে ইসলামের আইন সমূহ জারী করার জন্যে আমাদের এই মুহূর্তেই করতে হবে। যে সংশোধনমূলক কর্মসূচীর দিকে আমি ইতিপূর্বে ইংগীত প্রদান করেছি সে ব্যাপারে জীবনের প্রায় দিকেই আমাদের বেশ কিছু গঠন মূলক কাজ করতে হবে। কেননা দীর্ঘদিনের স্থবিরতা, গোলামী ও পতনের কারণে আমাদের সমাজ দেহের প্রতিটি দিকই বিনষ্ট হয়ে পড়েছে। কিন্তু এখানে আমার বিষয়বস্তু একটি বিশেষ পর্যায়ে সীমাবদ্ধ বলে আমি অন্যান্য দিকের গঠন মূলক কাজ কর্মের কথা বাদ দিয়ে শুধু আইন ও বিচার ব্যবস্থার সাথে সম্পর্ক যুক্ত বিষয়ই আলোচনা করবো।

১. একটি আইন একাডেমী প্রতিষ্ঠা

এ ব্যাপারে সর্বাগ্রে আমাদের যা করতে হবে তা হচ্ছে, একটি আইন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা। এই একাডেমীই আমাদের পূর্ব পুরুষদের কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা করবে এবং ইসলামী ফেকার সে সব মূল্যবান কিতাব সমূহের শুধু বংগানুবাদই করবেনা–এসব মূল্যবান বিষয়গুলোকে যা ইসলামী ফেকাহ জানার জন্যে অপরিহার্য্য–বর্তমান যুগের পদ্ধতি অনুযায়ী নতুনভাবে ঢেলে সাজাবে, এ উপায়েই এ থেকে পূর্ণ উপকার পাওয়া যেতে পারে। আপনারা জানেন, আমাদের ফেকাহর আসল সম্পদ সব আরবী ভাষায়। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় সাধারণতঃ এ ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ। এই অজ্ঞতার কারণে কিছু শোনা কথার ওপর ভিত্তি করে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রায়ই মূল্যবান সে সব সম্পদ সম্পর্কে নানা ধরনের ভুল ধারনা পোষণ করেন। এমন কি তাদের অনেক লোক তো এমন মন্তব্যও করে বসেন যে, এ সব অপ্রয়োজনীয় ও বিতর্কমূলক বিষয়াবলীকে ফেলে দেয়া দরকার। সব বিষয়ে নতুন ইজতেহাদ করে কাজ করতে হবে। প্রকৃত কথা হচ্ছে, যারা এ ধরনের অর্থহীন চিন্তাধারা প্রকাশ করেন, তারা শুধু নিজেদের চিন্তা ও বিবেকের দৈন্যের রহস্যই প্রকাশ করেন, যদি তারা তাদের পূর্ব পুরুষদের ফেকাহ শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অবদানগুলো

সম্পর্কে গবেষণা করতেন, তাহলে তাঁরা দেখতে পেতেন যে, গত বারো তেরোশ বছরে আমাদের শ্রদ্ধেয় পূর্ব পুরুষরা শুধু অর্থহীন বিতর্কেই সময় নষ্ট করেননি বরং তারা পরবর্তী বংশধরদের জন্যে রেখে গেছেন এক মহান উত্তরাধিকার। তারা অনেক প্রাথমিক মনযিল আমাদের জন্যে নির্মাণ করেছেন। আমাদের চেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি কেউ হবেনা, যদি আমরা এই বিশাল প্রাসাদকে শুধু অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে মিছে মিছি ধ্বংস করে নতুন করে তা বানাবার অনুযোগ করি। আমাদের জন্যে জ্ঞানের কাজ হবে, যাকে পূর্ববর্তী লোকেরা তৈরী করেছেন তাকে কার্যকরভাবে কাজে লাগানো, ভবিষ্যতে যেসব প্রয়োজন দেখা দেবে তার জন্যে গঠনের কাজ অব্যাহত রাখা। নতুবা যদি আমরা প্রত্যেকে আমাদের পূর্ববর্তিদের কার্যকলাপকে অর্থহীন ভেবে ফেলে দিয়ে নতুন করে কিছু বানাবার চেষ্টা করি, তাহলে কোনো দিনই আমরা উন্নতির পথে পা বাড়াতে পারবোনা।

এ ব্যাপারে আমার প্রথম দিককার আলোচনায় আমি বলেছিলাম, বিগত শতাব্দীতে দুনিয়ার এক বৃহৎ অংশে মুসলমানরা যেসব রাজ্য কায়েম করেছিলো তার সব কয়টির আইনই ছিলো এই ইসলামী ফেকাহ। সে সময়ের মুসলমানরা শুধু ঘাস উপড়ায়নি–তারা একটি বলিষ্ঠ তমুদ্দুনেরও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তাদের এ বিশাল তমদ্দুনের সব প্রয়োজনেই ফেকাহশাস্ত্রবিদরা এই ইসলামী আইনকেই ব্যবহার করেছেন। এরাই এই রাষ্ট্রের জজ ম্যাজিষ্ট্রেট ও চীপ জাষ্টিস নিযুক্ত হতেন। তাদের ফায়সালার দ্বারা বিচার বিবরণীর ব্যাপক সম্পদ তৈরী হতো, তারা আইনের প্রায় সব কয়টিই বিভাগ নিয়েই আলোচনা করেছেন। শুধু দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনই নয়; শাসনতান্ত্রিক ও আন্তর্জাতিক আইনের বিভিন্ন সুক্ষ্ম বিষয়েও তাদের কলম থেকে এমন মুল্যবান তথ্য বেরিয়েছে, যা দেখে একজন আইন বিশারদের দৃষ্টির ব্যাপকতার প্রশংসা না করে পারা যায় না। প্রয়োজন হচ্ছে, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে একটি দলকে এই কাজে নিয়োজিত করা যারা বর্তমান যুগের আইনের গ্রন্থরাজীর পাশাপাশি সে সব মূল্যবান বিষয়কেও সাজিয়ে দেবে।

বিশেষ করে বেশ কয়টি গ্রন্থ এমন আছে, যার অবশ্যই বংগানুবাদ হওয়া দরকার।

১. কোরআনের আইনের পর্যায়ে তিনটি কিতাব ঃ 'জেস্সাছ', 'ইবনুল আরাবী' ও 'কুরতবী'।

এ সব কিতাবের অনুশীলন আমাদের আইনের ছাত্রদের কুরআন থেকে সমাধান বের করার পদ্ধতি শিক্ষা দেবে, এতে কোরআনের সমস্ত বিধি নিষেধ সম্বলিত আয়াতের ব্যাখা দেয়া হয়েছে। হাদীস ও সাহাবাদের আসারে এর যেসব ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এতে তা উদ্ধৃত করা হয়েছে। এবং বিভিন্ন আয়িম্মায়ে মোজতাহেদীন এর থেকে যে বিধি বিধান বের করেছেন সেগুলো যুক্তিসহ এতে পেশ করা হয়েছে।

২. দ্বিতীয় মুল্যবান সম্পদ হচ্ছে, হাদীসের গ্রন্থরাজীর ব্যাখ্যা সমূহ। যাতে বিধি বিধান ছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ের উদাহরণ ও তার ব্যাখ্যামূলক বিবরণ পাওয়া যায়। এর মধ্যে বিশেষভাবে এই সব কিতাবের বাংলা অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন।

বোখারী শরীফের ব্যাপারে 'ফতহুলবারী' ও 'আইনী'। মুসলিম শরীফের 'নবভী' ও মওলানা শিববীর আহমদ ওসমানীর 'ফতহুল মুলহাম'। আবু দাউদে 'আওনুল মাবুদ' এবং 'বজলুল মাজহুদ', মুয়াত্তার ক্ষেত্রে শাহ ওয়ালী উল্লাহর 'মূসাওয়া মুসাফফা' এবং বর্তমান যুগের একজন হিন্দুস্থানী আলেমের লিখা 'আওজাযুল মাছালেক'। মুনতাকিয়াল আখবারের ব্যাপারে শাওকানীর 'নাইনুল আওতার'। মেশকাতে মওলানা ইদ্রীস কান্দালভীর 'আততা'লীকুস্ সাব্বীহ' এলমুল আসারে ইমাম তাহাবীর 'মায়ানীয়াল আ'সার'।

৩. এরপর আমাদের ফেকা শাস্ত্রের সেসব বড়ো বড়ো গ্রন্থসমূহের দিকে তাকানো দরকার, যেগুলোকে এ পর্যায়ে মৌলিক গ্রন্থ বলা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে এই গ্রন্থগুলোর অবশ্যই অনুবাদ হওয়া দরকার।

হানাফী ফেকায় ইমাম সারাখসীর 'আল মাবসুত' এবং শরহে আস্সিয়ারুল কাবীর'। কাসানীর 'বাদায়েউস্ সানায়ে' ইবনুল হুম্মামের 'ফাতহুল কাদীর' 'হেদায়া' ও 'ফতোয়ায়ে আলমগীরি'।

শাফেয়ী ফেকাহায় 'কিতাবুল উম্' 'শারহুল মুহাজ্জাব' 'মুগনিয়াল মুহতাজুল মূদাওয়ানাহ' এবং অন্য যেকোনো বই জ্ঞানবানরা বিবেচনা করবেন। হাম্বলী ফেকাহয় ইবনে কুদামার 'আল মুগনি' জাহেরী ফেকার ওপর ইবনে হাজামের

'আল মুহাল্লা' চার মাজহাবের ওপর ইবনে রুশদের 'বেদায়াতুল মুজতাহিদ' মিশরীয় আলেমদের প্রণীত 'আল ফেকহু ফি মাজাহেবে আরবায়া।' ইবনে কাইয়েমের 'জাদুল মায়াদের' ওই অংশ, যা আইনের সাথে সম্পৃক্ত।

বিশেষ বিশেষ সমস্যার ওপর ইমাম আবু ইউসুফের 'কিতাবুল খারাজ', ইয়াহিয়া বিন আদামের 'আল খারাজ' আল কাসেমের 'আল আমৃওয়াল' হেলাল বিন ইয়াহিয়ার 'আহকামল ওয়াক্ফ' ও দিময়াতীর 'আহকামুল মাওয়ারীস'।

৪. অতপর আমাদের আইনের মূলনীতি ও শরীয়তের টেকনিকের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কিতাবেরও বংগানুবাদ করা দরকার। এর সাহায্যে আমাদের আইনবিদরা ইসলামী ফেকাহর সঠিক জ্ঞান ও তার তত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে পারবেন। আমার মনে হয় এ ক্ষেত্রে এসব কেতাব নির্বাচিত হওয়ার অধিকার রাখে।

ইবনে হাজামের 'উসূলুল আহকাম' আল্লামা আমেদীর 'আল আহকামু লি উসুলিল আহকাম' খাজরীর 'উসূলুল ফেকাহ' শাতেবীর 'আল মুয়াফেকাত' ইবনে কাইয়েমের 'আ'লামুল মুকেয়ীন এবং শাহ ওয়ালী উল্লাহর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ'।

এই গ্রন্থ সমূহের ব্যাপারে আমাদের শুধু বাংলা অনুবাদ করেই ক্ষান্ত হলে চলবেনা বরং তার বিষয়াবলীকে বর্তমান যুগের আইনের গ্রন্থ সমূহের মতো করে নতুন ভাবে সাজাতে হবে, নতুন বিষয়সূচী ঠিক করে নিতে হবে, বিক্ষিপ্ত বিষয়াবলীকে একই শিরোনামের অধীনে একত্রিত করতে হবে, সূচীপত্র বানাতে হবে, ইনডেকস্ তৈরী করতে হবে। এই পরিশ্রম ছাড়া এসব বই আজকের দিনের উপযোগী হবেনা। অতীত দিনের সংকলনের ধরণ ছিলো ভিন্ন রকম, সে সময়ে আইনের বিষয়াবলীর জন্যে এতো শিরোনামাও দরকার ছিলোনা, যা আজকের দিনে দরকার। উদাহরণ স্বরূপ, তারা 'শাসনতান্ত্রিক আইন ও আন্তর্জাতিক আইনের জন্যে কোনো স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ তৈরী করেননি, বরং তারা এসব সমস্যাকে বিয়ে শাদী–রাজস্ব, (আদায় ও বন্টন) জেহাদ ও উত্তারাধিকার আইন ইত্যাদি ভাগেই বর্ণনা করেছেন। ফৌজদারী আইন নামে তাদের কাছে আলাদা কোনো পরিচ্ছেদ ছিলোনা, তারা এসব সমস্যাকে 'অপরাধের শাস্তি' পর্যায়ে বর্ণনা করেছেন। দেওয়ানী আইনওতারা স্বতন্ত্রভাবে সংকলিত করেননি,

তারা একই আইনের গ্রন্থে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে এগুলো বলে গেছেন। অর্থনীতি নামক স্বতন্ত্র কোনো বিষয়ও তাদের কাছে ছিলোনা। এ ধরনের বিষয়গুলোকে তারা বেচাকেনা, অংশীদারীত্বের ব্যবসায়, জায়গা জমির ফসলাদির সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে ভাগ করেছেন। এ ভাবেই সাক্ষ্য আইন, দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিধি, বিচার বিধি ইত্যাদি নতুন পরিভাষা তাদের গ্রন্থে ছিলোনা এই আইনের বিষয়াবলীকে তার কাজীর বৈশিষ্ট্য দাবী দাওয়ার পদ্ধতি, স্বীকৃতি ও সাক্ষ্যের পদ্ধতি ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এখন যদি এসব বই হুবহু বাংলায় তরজমা করা হয় তাহলে এর থেকে পূর্ণ উপকার লাভ করা যাবেনা। প্রয়োজন হচ্ছে কিছু আইনবিশারদদের এর ওপর কাজ করা। এর সম্পাদনা, সংকলন, পরিবর্তন করে তার বিষয়াবলীকে নতুন ভাবে ঢেলে সাজাতে হবে। যদিও চিন্তার রাজ্যে এটা খুব পরিশ্রমের কাজ বলে মনে হয়; কিন্তু কমপক্ষে এটুকু কাজতো হতেই হবে যে, নেহায়েত সুসমভাবে এর পূর্ণ ফিরিস্তি ও বিভিন্ন ইনডেক্স বানাতে হবে, যার ফলে অন্তত প্রয়োজন বশত তাকে খুঁজে পাওয়া যায়।

২. বিধি নিষেধ সমূহের সংকলন

দ্বিতীয় জরুরী কাজ হচ্ছে, দায়িত্বশীল আলেম ও আইনজ্ঞদের নিয়ে এমন একটি কমিটি বানাতে হবে, যারা ইসলামের আইনগত হুকুম আহকামগুলোকে আইন গ্রন্থ সমূহের মতো করে ধারা উপধারা আকারে সাজাবে। আমি আমার প্রথম আলোচনায় একথা পরিষ্কার করে বলেছি যে, ইসলামী দৃষ্টিভংগীতে এমন সব জিনিসকেই আইন বলেনা, যা কোনো ফকীহ মুজতাহিদের মুখ থেকে বের হয়েছে কিংবা তা ফেকাহর কোনো কেতাবে লিখা আছে। আইন শুধু চারটি বিষয়ের নাম ঃ

১. এরই এমন বিধান যা আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বর্ণনা করেছেন।

২. কোনো কুরআনী হুকুমের ব্যাখ্যা ও বিবরণী অথবা কোনো স্বতন্ত্র বিধান যা আল্লাহর নবী (সঃ) থেকে প্রমানিত হয়েছে।

৩. কোনো বের করা মাসয়ালা, কেয়াস, ইজতেহাদ, ইসতেহসান যার ওপর গোটা উম্মত কিংবা তার অধিকাংশের ঐক্যমত পাওয়া গেছে।

অধিকাংশের এমন কোনো ফতোয়া যা আমাদের দেশীয় মুসলমানদের অধিকাংশ লোকেরা তাকে গ্রহণ করে।

৪. এরই কাছাকাছি এমন কোন বিষয় যার ওপর সমকালীন ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল নির্বাচিত পরিষদের ঐক্যমত কিংবা তার ওপর অধিকাংশ লোকের ঐক্যমত পাওয়া যাবে।

আমার পরামর্শ হচ্ছে, প্রথম তিন ধরনের বিধি নিষেধগুলোকে বিশেষজ্ঞদের একটি দল কোড (CODE) এর মতো সংকলিত করবে। অতঃপর যতো আইনের ফায়সালা ভবিষ্যতে সার্বিক ঐক্য ও অধিকাংশের মতে স্বীকৃত হবে, আমাদের আইন বইগুলোতে তাও সংযোযিত হতে থাকবে। যদি এ ধরনের একটি কোড তৈরী হয়ে যায়, তাহলে তাহ হবে আসল আইন। অন্যান্য ফেকাহর কিতাব তার ব্যাখ্যা হিসেবে পরিগনিত হবে। সাথে সাথে আদালতেও ইসলামী আইনের প্রতিষ্ঠা ও আইন কলেজ সমূহেও এ আইনের শিক্ষা সহজ হবে।

৩. আইন শিক্ষার সংস্কার

চতুর্থ জরুরী কাজ হবে, আমাদের এখানে আইন শিক্ষার পুরনো পদ্ধতি পরিবর্তন করা। আমাদের আইন কলেজসমূহের পাঠসূচী, পাঠ্য কার্যক্রমে এমন সংশোধন করা, যাতে ছাত্ররা ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার জন্যে চিন্তা ও চরিত্র উভয় দিক দিয়েই প্রস্তুত হতে পারে।

এখন পর্যন্ত আমাদের আইন প্রতিষ্ঠানসমূহে যে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে, তা আমাদের দৃষ্টিভংগীর একেবারে অযোগ্য। এর থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্ররা শুধু ইসলামী আইন সম্পর্কেই অজ্ঞ থাকেনা, তাদের মন মানসিকতাও অনৈসলামিক ধ্যান ধারনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে এমন চারিত্রিক গুণাবলী সৃষ্টি হতে থাকে, যা পাশ্চাত্য আইনের প্রতিষ্ঠার জন্যেই উপযোগী; ইসলামী আইনের জন্যে বলতে গেলে সর্বোতভাবে অনুপোযোগী। এ অবস্থাকে যতোক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন না করা হবে, এসব প্রতিষ্ঠানে যতোদিন পর্যন্ত ইসলামী মাপকাঠি মোতাবেক ফেকাহশাস্ত্রবিদ তৈরী করার ব্যবস্থা না হবে, আমাদের এখানে কোনোদিনই এমন লোক তৈরী হবেনা, যারা আদালতের বিচারক ও ফতোয়াদাতার দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার যোগ্য হতে পারবে। এ ব্যাপারে আমার

মনে যে সব প্রস্তাব ছিলো তা আমি আপনাদের কাছে পেশ করছি অন্যরাও এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারেন। এভাবে এই চিন্তার সংস্কার ও পরিবর্ধন সম্ভব হবে–যাতে করে সবার জন্যে গ্রহণযোগ্য একটি স্কীমও তৈরী হতে পারে।

১. সর্বাগ্রে সংশোধন এই হওয়া দরকার যে, ভবিষ্যতে আমাদের আইন কলেজ সমূহে ভর্তির জন্যে আরবী ভাষার জ্ঞান–এতটুকু জ্ঞান যা কুরআন হাদীস ও ফেকাহর কিতাব পড়ার জন্যে দরকার–অপরিহার্য্য করা হবে। যদিও আমরা ইসলামী আইনের পুরো শিক্ষাই বাংলায় দিতে চাই এবং এ বিষয়ের ওপর লিখা যাবতীয় কিতাবকেই বাংলায় ভাষান্তরিত করতে চাই, তবু আরবী ভাষার জ্ঞানের প্রয়োজন থেকে যাবে। কারণ ইসলামী ফেকাহর বুৎপত্তি সে ভাষার জ্ঞানার্জ্জন ছাড়া সম্ভব নয়, যে ভাষায় মহানবী (সঃ) কথা বলতেন। প্রথম প্রথম আমাদের আইন কলেজ সমূহে আরবী জানা প্রার্থী পাবার ব্যাপারে কিছু অসুবিধা হবে। সম্ভবতঃ এ উদ্দেশ্যে কয়েক বছর পর্যন্ত প্রত্যেক আইন কলেজে স্বতন্ত্র আরবী ক্লাশ চালু রাখতে হবে, এজন্যে আইন শিক্ষার জন্যে এক বছর অতিরিক্ত ব্যয়ও করতে হবে, কিন্তু পরবর্তী সময়ে আমাদের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় যখন আরবী ভাষা বাধ্যতামূলক হবে তখন আইন কলেজে ভর্তির এমন সব গ্র্যাজুয়েট আসবে যারা প্রথমেই আরবী ভাষার জ্ঞান সম্পন্ন হবে।

২. আরবী ভাষার সাথে সাথে এটাও জরুরী যে, আইনের শিক্ষা শুরু করার আগে ছাত্রদেরকে কুরআন হাদীসের প্রত্যক্ষ পড়ালেখার মাধ্যমে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মেজাজ ও তার পুরো পদ্ধতি অনুধাবনের ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের আরবী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে দীর্ঘদিন থেকে এই ভ্রান্ত পদ্ধতি চালু আছে যে, শিক্ষার শুরুই করানো হয় ফেকাহর কেতাব থেকে। অতপর প্রত্যেক মাজহাবের লোক নিজেদের বিশেষ দৃষ্টিভংগী নিয়েই হাদীস পড়ে এবং কুরআনের দু' একটি সূরা তাবারক হিসেবে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করে নেয়। তাতেও আল্লাহর কালামের সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য ছাড়া অন্য দিকে দৃষ্টিই প্রদান করা হয়না। এর ফলে সব চেয়ে বড়ো ক্ষতি হয়েছে, যারা এসব প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে বের হন। তারা নিজেদের পড়ে আসা শরীয়তের কতিপয় বিধান সম্পর্কে অবশ্যই ওয়াকেফ হন; কিন্তু যে দ্বীন কায়েমের জন্যে এসব আইন বানানো

হয়েছে, তাঁর সামগ্রিক ব্যবস্থা, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তারা অনেকাংশেই অজ্ঞ থেকে যান। তারা তখন এটুকুও জানতে পারেন না যে, দ্বীনের সাথে শরীয়তের, শরীয়তের সাথে ফেকাহর মজহাব গুলোর কি সম্পর্ক। তারা আইনের কতিপয় শাখা প্রশাখা ও স্বীয় মাজহাবের কিছু মাসয়ালাকেই আসল দ্বীন মনে করে নিয়েছেন। এই জিনিসটাই আমাদের দেশে নানা রকম ফের্কাবন্দী ও পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছে। এরই পরিণামে জীবন ব্যবস্থায় ফেকাহর মাসয়ালাকে প্রয়োগ করার কাজে বহুবার শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যকেও পর্যন্ত অবজ্ঞা করা হয়। আমরা চাই, এখন এই ভুলের সংশোধন হোক। কোনো ছাত্রকেই কুরআন হাদীস থেকে সঠিক দ্বীন শিক্ষার আগে আইন পড়ানোহবেনা।

এ ক্ষেত্রেও প্রথম দিকে কয়েক বছর পর্যন্ত আমাদের কিছু সমস্যার মুকাবেলা করতে হবে। কেননা কোরআন হাদীস জানা গ্র্যাজুয়েট প্রথম দিকে বেশী পাওয়া যাবে না, এ জন্যে আইন কলেজ সমূহেই আমাদের প্রথম এ ব্যবস্থা করতে হবে। যখন আমাদের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের অধীনে এসে যাবে, তখন সহজ ভাবেই এ নিয়ম বানানো যাবে যে, আইন কলেজে শুধু তারাই ভর্তি হবে যারা তাফসীর ও হাদীসকে বিশেষ বিষয় হিসেবে পড়ে গ্র্যাজুয়েট হয়েছে, নতুবা অন্য বিষয়ের ছাত্রদেরকে এক বছর অতিরিক্ত এই বিষয়ের জন্য ব্যয় করতে হবে।

৩. আইনের পাঠ্য তালিকায় তিনটি বিষয়কে অবশ্যই অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। একটি হচ্ছে, বর্তমান যুগের আইনের মূলনীতির (Jurisprudence) সাথে সাথে ফেকাহর মূলনীতিসমূহ। দ্বিতীয়, ইসলামী ফেকাহ্র ইতিহাস পর্যালোচনা। তৃতীয়, ফেকাহ্র সব বড়ো বড়ো মজহাবের নিরপেক্ষ পর্যালোচনা। এই তিনটি বিষয় ছাড়া ছাত্রদের মধ্যে ফেকাহর পূর্ণ জ্ঞান অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়। গুরুত্বপূর্ণ পদ মর্যাদার অধিকারী কাজী–মুফতী হওয়ার জন্যে ইজতেহাদের যে যোগ্যতা প্রয়োজন তা অর্জন করাও অসম্ভব। তাছাড়া এ না হলে আধুনিক রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তা'বীর, কেয়াস, ইজতেহাদ ও ইসতেহসানের সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করে আইন কানুন বানাবার মতো যোগ্যতা সম্পন্ন লোকও তাদের মধ্যে তৈরী হওয়া সম্ভব নয়। নিজেদের আইনের

মূলনীতি সমূহ বুঝা ছাড়া তারা কিভাবে নিত্য নতুন সমস্যার সমাধান করবে? নিজেদের ফেকাহর ইতিহাস না জানা থাকলে তারা কিভাবে জানতে পারবে যে, ফেকাহর বিবর্তন কিভাবে হয়েছে ও ভবিষ্যতে কিভাবে হবে? ফেকাহ শাস্ত্রবিদদের জমা করা বিশাল সম্পদ সম্পর্কে ব্যাপক পর্যবেক্ষণ ছাড়া তারা কিভাবে এই যোগ্যতা অর্জন করবে যে, কোনো সমস্যার যদি এক মাজহাবে সমাধান না পাওয়া যায় তাহলে তার সমাধানের জন্যে নতুন একটি মজহাব তৈরী না করেও অন্য কোনো মজহাবে তা অনুসন্ধান করা যাবে, এসব কারণেই আমি এটা জরুরী মনে করি যে এই তিনটি বিষয় অবশ্যই আমাদের আইন শিক্ষার পাঠ্য তালিকাভূক্ত হওয়া উচিৎ।

৪. শিক্ষার এ সংস্কারের সাথে সাথে আমাদেরকে আইন কলেজের ছাত্রদের নৈতিক প্রশিক্ষনেরও বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে আইন কলেজসমূহ ধূর্ত উকীল, স্বার্থন্বেষী ম্যাজিষ্ট্রেট ও অসাদাচারণকারী জজ তৈরী করার কারখানা নয় বরং তার কাজ হবে এমন ধরণের বিচারক ও মুফতী তৈরী করা, যারা স্বজাতির মধ্যে নিজেদের চরিত্র ও কাজ কর্মের দিক থেকে উন্নত ধরনের মানুষ হবে। যাদের সত্যবাদিতা, সততা ও ইনসাফের ওপর পরিপূর্ণ ভাবে নির্ভর করা যাবে, যাদের নৈতিক চরিত্র সমস্ত সন্দেহের উর্ধে থাকবে। এটা সেই জায়গা, যেখানে সবচেয়ে বেশী খোদাভীতি, সততা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়া উচিৎ। এখান থেকে বের হয়ে ছাত্রদের সে আসনের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে, যেখানে একদিন কাজী শুরায়হ্, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও কাজী ইউসূফের মতো লোকেরা বসেছিলেন। এখানে এমন মজবুত চরিত্রের লোক তৈরী হওয়া দরকার, যারা কোনো শরীয়তের মাসয়ালায় মতামত প্রকাশের সময় অথবা কোনো ব্যাপারে ফায়সালা করার সময় আল্লাহ ছাড়া কারো দিকেই লক্ষ্য দেবেনা, কোনো লোভ–লালসা, ভয়–ভীতি, কোনো স্নেহ–ভালোবাসা, কোনো ঘৃনা–বিদ্বেষ তাদের সে লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারবেনা, যাকে তারা তাদের জ্ঞান ও বিবেক দিয়ে সত্য ও ইনসাফ মনে করে।

৪. বিচার ব্যবস্থা সংস্কার

ইসলামী আইন জারী করার লক্ষ্যে পরিবেশ অনুকুল করার কাজে আমাদের বিচারালয়ের ব্যবস্থাপনায়ও বহুবিধ পরিবর্তন সাধন করতে হবে। এ ব্যাপারে ছোট ছোট বিষয় পরিহার করে আমি বিশেষ ভাবে দুটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই, এগুলো ইসলামের দৃষ্টিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৫. ওকালতী পেশার নির্মূল করণ

সর্বাগ্রে সংশোধন যোগ্য বিষয় হচ্ছে, বর্তমান ওকালতী পেশা সম্পর্কিত। আধুনিক বিচার ব্যবস্থার অনাচার সমূহের মধ্যে সম্ভবতঃ এটাই হচ্ছে নিকৃষ্টতম। নৈতিক দিক থেকে এর বৈধতার পক্ষে একটি অক্ষরও পেশ করা যায় না। বাস্তবেও বিচার ব্যবস্থার এমন কোনো প্রয়োজন নেই, যার জন্যে অন্য কোনো বিকল্প উদ্ভাবন করা যায়না। ইসলামের মেজাজ অনুযায়ী এই পেশার সাথে ইসলামের দূরত্ব এতো বেশী যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত এই পেশা জারী থাকবে আমাদের আদালত সমূহে ইসলামী আইন সঠিক স্পিরিটে চালুই হতে পারেনা। বরং আজ মানবীয় আইনের সাথে যে কাজ করা হচ্ছে, তা যদি কোথায়ও ইসলামী আইনের সাথে করা হয়, তাহলে আমরা যদি ইনসাফের সাথে ঈমানও হারিয়ে ফেলি তাতেও আশ্চর্য্যন্বিত হবার কিছু থাকবেনা। তাই এটা খুবই জরুরী যে, আস্তে আস্তে এই পেশাকে নির্মূল করে দিতে হবে।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে উকীলের কাজ হচ্ছে, আদালতের আইন বুঝা, বিচারাধীন মামলার ওপর তাকে যথাযথ প্রয়োগ করার কাজে সাহায্য করা। নীতিগত ভাবে এ প্রয়োজন স্বীকৃত। এটাও ঠিক যে, একই মামলায় দুইজন আইন বিশেষজ্ঞের মতামত ভিন্নতর হবে। হতে পারে একজনের রায়ে এক পক্ষের মোকদ্দমা মজবুত হবে, দ্বিতীয় জনের মতে সে মোকদ্দমা হবে দুর্বল। এবং আদালতকেও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্যে দুই পক্ষের যুক্তি প্রমাণ সম্পর্কে জেনে নেয়া অবশ্যই দরকারী। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই বিষয়টাকে বাস্তবায়িত করার যে পদ্ধতি ওকালতের আকারে এখানে প্রচলিত আছে তার থেকে কি এই দ্বিবিধ উপকার পাওয়া যাচ্ছে? একজন উকীল এখানে আইনের যোগ্যতা নিয়ে ব্যবসার জন্যে বসে থাকে এবং সদা এজন্যে প্রস্তুত থাকে যে, কোনো মামলার যে

কোনো পক্ষ তার মস্তিষ্কের ভাড়া আদায় করে তাকে কাজে লাগাতে পারে এবং সেও তার মক্কেলের পক্ষে আইনের ধারা বের করতে শুরু করবে, তার এটা জানা দরকার নেই যে, আমার মক্কেল সত্যের ওপর আছে, না মিথ্যের ওপর, অপরাধী না নিরপরাধ, সে নিজের অধিকার পেতে চায়, না অন্যের অধিকার ছিনিয়ে আনতে চায়, এ ব্যাপারেও তার কোনো মাথাব্যথা নেই। এ পর্যায়ে সত্যিই আইনের পন্থা কি হবে, এবং সে আলোকে তার মক্কেলের মোকদ্দমা সত্য না মিথ্যে?' সে শুধু এটুকু দেখে যে, মক্কেল তাকে তার মস্তিষ্কের 'ফি' দিয়েছে কিনা। তাই তার কাজ তার পক্ষ সমর্থন করা। এ জন্যে সে মামলাকে নতুন ভাবে আইনের আলোকে সাজিয়ে নেয়, দুর্বল বিষয় গুলোকে গোপন করে অনুকুল বিষয় গুলোকে সামনে নিয়ে আসে। মামলার বিবরণী ও সাক্ষ্য প্রমান থেকে বেছে বেছে শুধু ওসব বিষয়ই বের করে, যা তার মক্কেলের এই মামলায় কাজে আসতে পারে, সাক্ষ্যকে ভেংগে দেয়ার চেষ্টা করে, যেনো মামলায় সঠিক ঘটনাবললী–যদি তা তার মক্কেলের বিপক্ষে যায়–একেবারে মিথ্যে প্রমান করতে না পারলে, কমপক্ষে সন্ধিগ্ধ করে তোলা যায়। আইনের উদ্দেশ্য মূলক ব্যাখ্যা করে এবং সে অনুযায়ী যুক্তি খাড়া করে বিচারককে ভুল পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করে, যেনো তার কলম দিয়ে ইনসাফ মোতাবেক রায় নয়–তার মক্কেলের পক্ষেই রায় বেরোয়। এখন চাই কোনো সঠিক অপরাধী ছাড়া পেয়ে গেলো, কিংবা কোনো নিরপরাধ ব্যক্তি ফেঁসে গেলো, কোনো ব্যক্তি তার অধিকার হারিয়ে ফেললো, আবার কোনো ব্যক্তি অন্যের অধিকার কেড়ে নিলো, উকীলের তাতে কিছু আসে যায় না। সে তো সত্যের পক্ষে ও ইনসাফ করাবার জন্যে ওকালত খানায় বসেনি, তার উদ্দেশ্য হলো পয়সা। যে তাকে টাকা দেবে সেই সত্যের ওপর আছে, চাই সে মামলার প্রথম পক্ষ হোক কিংবা দ্বিতীয় পক্ষ। আমি জিজ্ঞেস করি, কোনো নৈতিক বিবেচনায় কি এই আইনবাজীকে জায়েজ মনে করা যেতে পারে? কোনো বিবেকবান, খোদাভীতি সম্পন্ন ও ঈমানদার ব্যক্তি শুধু 'ফি'র বিনিময়ে এতো বড়ো দায়িত্ব নিজের মাথায় নিতে পারে যে, মাজলূমকে বিচার থেকে মাহরুম করা ও জালেমের জুলুম অব্যাহত রাখার ব্যাপারে সে চেষ্টা করে যাবে, এই আইনজ্ঞদের কোনো পরামর্শ কি কোনো বিচারককে ইনসাফের কাজে কোনো সাহায্য করতে পারে? যে ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে এই উদ্দেশ্যে 'ফি' নিয়েছে যে, আইনের ব্যাখ্যা সে তার

মক্কেলের পক্ষেই করবে। কোনো আইনের বিষয়ে একই মোকদ্দমায় দুই প্রতিপক্ষের মতবিরোধ শুধু কি কখনো ঈমানদারীর ভিত্তিতে সাধিত হয়েছে? অথচ দুই জন উকীলই অত্যন্ত জোরের সাথে সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী মতামত পেশ করে, যা সত্য হলে উভয়ের মক্কেলই বদলে যেতো।

সত্যি কথা হচ্ছে, এই ওকালতী পেশা আমাদের বিচার ব্যবস্থাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্তই করেনি–শুধু এটুকুই করেনি যে, আমাদের সমাজে আইনের আনুগত্যের পরিবর্তে আইনের বিরুদ্ধতা করার শক্তিকেই বৃদ্ধি করেছে–বরং তার ক্ষতি আমাদের সমগ্র জীবনেও ব্যাপ্তি লাভ করেছে। আমাদের রাজনীতিও এ কারণে নোংরামীতে ভরে উঠেছে। মুখের কথা ও বিবেকের একটাকে আরেকটা থেকে বিচ্ছিন্ন করার ট্রেনিং আপনাদের কলেজের বিতর্ক সভাগুলো থেকেই শুরু করেছে। এখানে একজন কথকের আসল গুণ হচ্ছে, সে একই বিষয়ের ভালো মন্দ উভয় দিকের সপক্ষে একই রকম জোরের সাথে কথা বলতে পারে, যেদিকেই দাঁড় করিয়ে দেয়া হোক না কেন সে যুক্তির পাহাড় সৃষ্টি করে দিতে পারে–তার ব্যক্তিগত মতামত তার যতো বিপক্ষেই হোক তাতে কিছুই আসে যায়না। এই প্রাথমিক ট্রেনিংই পরবর্তী পর্যায়ে ওকালতী পেশায় ঢুকে তাকে মারাত্মকভাবে কলুষিত করে। অতপর যখন একজন ওকীল বহু বছর পর্যন্ত মনের বিরুদ্ধে মস্তিষ্ক চালনা করে ও বিবেকের বিরুদ্ধে কথা বলে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তখন সে তার এই চরিত্র নিয়ে আমাদের জাতীয় জীবনে প্রবেশ করে এবং সে তার এ চরিত্রগত বিষ প্রভাবকে আমাদের শিক্ষা, সমাজ ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়।

ইসলাম এই পেশাকে কিছুতেই বরদাস্ত করতে রাজী নয়। তার পুরো ব্যবস্থায় এ পেশার কোনো স্থান নেই। এটা তার মেজাজ, তার প্রকৃতি ও তার ঐতিহ্যের বিরোধী। বিগত দশ বারো শতক পর্যন্ত দুনিয়ার অর্ধাংশের (ক্ষেত্র বিশেষে বেশী) ওপর মুসলমানরা রাজত্ব করেছে, কোথায়ও বিচার ব্যবস্থায় এর লেশমাত্র ছিলোনা। তার পরিবর্তে আমাদের এখানে মুফতীর পদ মর্যাদা ছিলো–এখন আমাদের তাই পুনরুজ্জীবিত করা দরকার। আগের দিনে মুফতীরা বেশীর ভাগ নিজেদের জীবিকার জন্যে কোনো স্বাধীন কারবার করতেন, আর ফতোয়া

দিতেন বিনা পারিশ্রমিকে। আজকের ক্রম বর্ধমান প্রয়োজনের তুলনায় বেশ কিছু পরিমান আইন বিশারদ- যাতে আইনের বিশেষ বিশেষ বিভাগের বিশেষজ্ঞরা শামিল থাকবেন–সরকারীভাবে নিয়োগ করা যেতে পারে এবং তাদের সরকারী কোষাগার থেকে যথোপযুক্ত বেতন দেয়া হবে। তাদের কাছে মামলার উভয় পক্ষের যাওয়া এবং তাদের কিছু 'খেদমত' করা আইনত নিষিদ্ধ হবে। এভাবে রাষ্ট্রেরও তাদের মতামতে হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার থাকবেনা, যেভাবে আদালতের বিচারকদের ওপর চাপ প্রয়োগের কোনো অধিকার রাষ্ট্রের নেই। বিচারালয় স্বয়ং নিজেদের প্রয়োজনে এসব মুফতীদের কাছে আদালতের বিবরণী পাঠাবে এবং তাদের কাছ থেকে মতামত গ্রহণ করবে, যদি তাদের মধ্যে মত বিরোধ হয় তবে তারা আদালতে এসে তারা তাদের মতামত পেশ করতে পারেন, মোকদ্দমার ঘটনাবলীর অনুসন্ধানের জন্যে আদালত নিজেও সাক্ষ্যকে জেরা করবে, মুফতীদেরও সুযোগ দিতে হবে। তারা ওসব ঘটনা জানার চেষ্টা করবে যার প্রভাব এই মামলায় পড়তে পারে, এভাবে আদালতের আইন অনুধাবনে ও মোকদ্দমাসমূহের ওপর একে প্রয়োগ করার ব্যাপারে সত্যিকার সাহায্য পাওয়া যাবে। মুফতীদের সত্যিকার মতবিরোধের ফলে অনেক আইনগত সমস্যাই পরিষ্কার করে দেবে, আদালতের অনেক মূল্যবান সময় যা এখন বানানো মোকদ্দমা ও কৃত্রিম সাক্ষ্য প্রমানের কারণে নষ্ট হচ্ছে তা বেঁচে যাবে। এই ওকালতী পেশার কারণে মোকদ্দমার যে ছড়াছড়ি ও মামলাবাজী আমাদের সমাজে চালু আছে তাও চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন হলো, যদি মামলাকে নিয়মানুযায়ী তৈরী করে আদালতে পেশ করার বিশেষ লোক সমাজে না থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট সবাইকে বহু অসুবিধায় পড়তে হবে, তারা বিভিন্ন অনিয়মতান্ত্রিক ভাবে মামলা দায়ের করে আদালতকেও অসুবিধায় ফেলবে। এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে, এজন্যে আমাদেরকে মোখতারীর সেই পুরনো পদ্ধতিকে জীবিত করতে হবে, যা আমাদের আদালতে দীর্ঘ দিন ধরে চালু ছিলো, আমাদের আইন কলেজের সাথে সাথে এ সব পরিপূরক ক্লাশও হওয়া দরকার যেখানে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত লোকেরা শুধু আইনের পদ্ধতি পড়বে এবং আদালতের বাস্তব কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হবে। এদের কাজ হবে কোনো মোকদ্দমাকে আইনগত পদ্ধতির মাধ্যমে আদালতে

পেশ করার যোগ্য বানিয়ে দেয়া এবং বিভিন্ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে পদ্ধতিসমূহ বলে দেয়া। এরা যদি 'ফি' নিয়েও প্র্যাকিটিস করে, তাহলেও সেই অনাচার সৃষ্টির আশংকা নেই যা ওকালতী পেশার দ্বারা সৃষ্টি হতে পারে।

৬. কোর্ট ফি রহিতকরণ

দেশের বিচার ব্যবস্থাকে ইসলামের নির্দেশিত পথে আনয়নের জন্যে আরেকটি জরুরী সংস্কার হচ্ছে, আমাদেরকে এখানে কোর্ট ফি তুলে দিতে হবে। এ এক নিকৃষ্টমানের বেদয়াত। পাশ্চাত্যের গোলামীর আগে আমরা এর সাথে পরিচিত ছিলাম না। ইসলামের প্রকৃতিতে এই ধারনাই নেই যে, আদালত বিচার প্রদানের পরিবর্তে ইনসাফের দোকান খুলে বসবে–যেখান থেকে পয়সা না দিয়ে কেউই বিচার পেতে পারবে না, যেখানে গরীব লোকের ভাগ্যই এই যে, সে জুলুম সইবে–বিচার পাবেনা। আমরা চাই, ইংরেজ রাজত্বের সাথে সাথে তার এই স্মৃতিও বিদায় নিক এবং আমাদের আদালত সমূহ পুনরায় ইসলামী নির্দেশিত পথের ওপর কায়েম হোক–এই ব্যবস্থায় মানুষকে বিচার পৌছানো একটি ব্যবসায়িক কাজ নয় বরং একটি ইবাদত এবং বিনা পারিশ্রমিকের খেদমতও বটে।

আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যদি কোর্ট ফি উঠিয়ে দেয়া হয় তাহলে আদালতের খরচপত্র কোথেকে সরবরাহ করা হবে, এ কথার জবাবে আমি দুটি কথা পেশ করবো। এক, ইসলামী ব্যবস্থায় এতো লম্বা চওড়া আদালত ও এতো বিপুল কর্মচারীর দরকার নেই, যাকে বর্তমান বিচার ব্যবস্থা অপরিহার্য্য করে রেখেছে। ওকালতী পেশার রহিতকরণে মোকদ্দমাবাজী অনেক হ্রাস পাবে। বিচারের ও মোকদ্দমার দীর্ঘসূত্রীতাও আজকালের তুলনায় অনেক কমে আসবে। অতপর সমাজের নৈতিক চরিত্র, সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনীতির সংস্কারও মোকদ্দমাবাজীকে কমিয়ে আনার ব্যাপারে অনেকাংশে সাহায্য করবে, পুলিশ ও জেল কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ও কর্মপদ্ধতি থেকে অপরাধের সংখ্যা হ্রাস পাবে।[১]

---

[১] এখানে সম্ভবত এ ঘটনার উল্লেখ অপ্রয়োজনীয় হবে না যে, হযরত ওমর (রাঃ) এঁর যুগে একবার কুফার প্রধান বিচারপতি হযরত সালমান বিন রাবিয়া বাহেলী তার বিচারালয়ে একাধারে চল্লিশ দিন শুধু হাতের ওপর হাত রেখে বসেছিলেন, শুধু এ জন্যে যে তার কাছে আদৌ কোনো মামলাই আসেনি। (আল ইস্তিয়াব খন্ড ২, পৃষ্ঠা–৫৮) এর থেকেও আশ্চর্য্যজনক ঘটনা হচ্ছে, হযরত আবু

এ ভাবে আমাদের বিচার ব্যবস্থার জন্যে এতো বেশী জজ ম্যাজিষ্ট্রেট ও কেরানীর দরকার হবেনা, যতো সংখ্যক আজকের দিনে প্রয়োজন হয়েছে। এ ভাবেই আদালতের অন্যান্য খরচপাতিও কমে যাবে। তাছাড়া বড়ো বড়ো আমলাদেরও ইসলামী রাষ্ট্রে এতো বেতন হবেনা–যতো আজ আছে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এই সুবিধে হাসিলের পর বিচার ব্যবস্থার খরচের যে সামান্য বোঝা আমাদের কোষাগারের ওপর পড়বে, তাকে আমরা বিচার প্রার্থীর ওপর না বর্তায়ে ওসব লোকের ওপর ফেলবো যারা বিচারালয়ে অযাচিত ফায়দা লুটতে আসে, অথবা যারা আদালতের খেদমতের ফলে অসাধারণ ভাবে উপকৃত হয়েছে। যেমন, মিথ্যে মামলা দায়েরকারী, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারী ও আদালতের সমন বাস্তবায়নে অবহেলা প্রদর্শন কারীর ওপর জরিমানা ধার্য্য করা যাবে। অপরাধীদের কাছ থেকে যে অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায় হবে তাও এর সাথে যোগ করা হবে এবং একটি বিশেষ অংকের ডিক্রী যাদের পক্ষে দেয়া হবে, তাদের ওপর একটি বিশেষ ট্যাক্স বসাতে হবে। এসব কিছু করার পরও যদি বিচার বিভাগের বাজেটে কোনো ঘাটতি আসে তবে তা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে পূরণ করা হবে। কারণ মানুষের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করাতো ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্বেরই অন্তর্ভূক্ত।

শেষ কথা

এই কয়েকটি প্রস্তাবই আমার কাছে ছিলো। এদেশে ইসলামী আইনকে জারী ও প্রতিষ্ঠার জন্যে এগুলো বাস্তবায়িত হওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। আমি চাই দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় বিশেষ করে ওসব লোক যারা আদালতের বাস্তব অভিজ্ঞতা রাখেন তারা এ ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করুন এবং এ বিষয়টিকে পূর্ণাংগ রূপ দেয়ার চেষ্টা করুন। আমি মনে করি যারা এতোদিন পর্যন্ত ইসলামী আইনকে আদৌ সম্ভবই নয় বলে মনে করতেন তারা আমার নিবেদনের পর

বকরের (রাঃ) খেলাফতের যুগে যখন হযরত ওমর (রাঃ) মদীনার কাজী ছিলেন, পুরো একটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে তার কাছে একটি মোকদ্দমাও বিচারের জন্যে হাযির করা হয়নি। (আস্‌সিদ্দিক আবু বকর, সম্পাদনা মোঃ হোসাইন হায়কল পাশা পৃষ্ঠা–২১০)

এ থেকে বুঝা যায় যদি সঠিক ভাবে ইসলামের সংস্কারমূলক স্কীমগুলোকে সমাজে জারী করা হয় তাহলে মোকদ্দমাবাজী কতো হ্রাস পায়।

কিয়দংশে অন্ততঃ নিশ্চিত হতে পেরেছেন। তারা এটাও জানতে পেরেছেন যে, ইসলামী আইন কিভাবে জারী হতে পারে এবং এর বাস্তব উপায়গুলো কি। কিন্তু আমি আগেই বলেছি, পৃথিবীতে কোনো কিছুরই প্রতিষ্ঠা অসম্ভব নয়–যদি তার জ্ঞানসম্পন্ন ও আগ্রহশীল নির্মাতা পাওয়া যায় এবং তার প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণও তার কাছে মজুত থাকে। এই দুইটি বস্তু যেখানে পাওয়া যাবে সেখানে সব কিছুই তৈরী হতে পারে, চাই তা মাসজিদ হোক কিংবা শিবমন্দির।

সমাপ্ত